কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের

ছোটোদের শ্রেষ্ঠ গল্প

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির

৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৬২
সেপ্টেম্বর ১৯৫৫
দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ় ১৩৬৫
জুলাই ১৯৫৮
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা ১২
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
সমীর রায়চৌধুরী
ছেপেছেন
মনোজকুমার দত্ত
সাক্ষর মুদ্রণী
৪, মধু পাল লেন
কলকাতা ৫

বর্তমান সংকলন-গ্রন্থে যে-গল্পগুলি ছাপা হোলো তাদের ভিতর তিনটি গল্প—'ছাতুবাবুর ছাতা' 'ঘনশ্যামের ঘোড়া' এবং 'মর্মর'—আমার তিনটি বিভিন্ন বইতে ছাপা হয়েছে। 'মর্মর' গল্পটি 'বুক এম্পোরিঅম' কর্তৃক প্রকাশিত 'ভূতের গল্পের সংকলন' গ্রন্থেও ছাপা হয়েছিলো। অন্যান্য গল্পগুলি গত বারো বছর ধরে নানা সময়ে নানা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে।
ছোটোদের মন অদ্ভুত এক রাজত্ব। নতুন-নতুন পথে তাদের মানসিক অভিযান। তারা রূপকথা শুনতে ভালোবাসে, অ্যাডভেঞ্চার খোঁজে, আর ভূতের গল্পের তো কথাই নেই। তারা ভয় পেতে চায়, হাসতে চায়, কাঁদতে চায়, রোমাঞ্চিতও হতে চায়। কিন্তু ভয় পেতে চাইলেও তাদের ভয় পাওয়ানো উচিত নয়, হাসতে চাইলেও কখনো সস্তা হাসি তাদের পরিবেশন করতে নেই, অ্যাডভেঞ্চার চাইলেও তাদের নিচু ধরনের খুন-খারাপির গল্প বলা অন্যায়। দুঃখের বিষয় বাংলা দেশে আমার একাধিক সাহিত্যিক বন্ধুরা ছোটোদের জন্য লেখার সময় এই কথাগুলি ভুলে যান। তাঁদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা যেন আবার নতুন করে এই কথাগুলি মনে-মনে আলোচনা করে দেখেন।

উপরের কথাগুলি পড়ে কেউ যেন মনে না করেন আমার ছোটোদের গল্পগুলি আদর্শ হিসেবে প্রচার করতে চাইছি। বলা বাহুল্য সে-রকম ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে যদি আমি আংশিক ভাবেও কোথাও-কোথাও সফল হতে পেরে থাকি তাহলে আমার মনের মধ্যে যে শিশু আছে—যে-শিশু সবাইকার মনের মধ্যেই আছে—সে খুসি হবে।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা
২১শে ভাদ্র, মঙ্গলবার
১৩৬২ সাল

বাপিবাবা, টুলুবাবু, তাল্লুবাবা
আর রুনুবাবুর জন্য

॥ আলপিন ॥

বিল্লুর বৌদি বললো, 'আজ মিসেস চক্রবর্তীর বাড়ি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডিনার। আমাদের ইনভাইট করেছে। সবাইকে। বিল্লু, তুমিও যাবে তো ?'

বিল্লুর মাসতুতো দাদা, যার বাড়ি সে বেড়াতে এসেছে, বললো, 'যাবে বৈকি ! সোসাইটিতে মিশতে শিখুক। শুধুই স্কলারশিপ পেলে চলবে না তো !—তুমি বরঞ্চ ওকে টেবল-ম্যানার্সগুলো ভালো করে শিখিয়ে দিও। এখনো সময় ঢের আছে। আর ও ইনটেলিজেণ্ট, চট করে শিখে নেবে।—তোকে, বিল্লু, একটা কথা বলে রাখি। তুই বড্ড ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে জল গিলিস। ভেরি ব্যাড ম্যানার্স। জল এমনভাবে খাবি যাতে পাশের লোকটি পর্যন্ত টের না পায়। আর খবরদার, ডান হাতে গেলাস তুলবি না। সর্বদা বাঁ হাতে—'

কথাটা শেষ না করে বীরেন তার পাইপটা ধরাতে ব্যস্ত হোলো।

'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডিনার কী বীরেনদা ? স্বাধীনতার ভোজ ? না স্বাধীন ভোজ ?' এই প্রথম বিল্লু কথা বলবার ফুরসৎ পেলো।

'আজ ফিফ্‌টিন্থ আগস্ট না ?—সে কারণেই মিসেস চক্রবর্তীরা ইনভাইট করেছে। ভারি ভালো লোক। একেবারে কারেক্ট—তুই স্যুট আনিসনি তো ? যাক গে, আজ কিছু এসে যাবে না। আজ ইণ্ডিয়ান ড্রেস অ্যালাউড। ধুতি-পাঞ্জাবি উইল ডু।—কুইনি, আমার ধুতি-টুতিগুলো আছে তো ?'

কুইনি, অর্থাৎ বিল্লুর বৌদি, উত্তর দিলো, 'সব ঠিক আছে বীরেন।'

তার বীরেনদাকে বিল্লু বহুকাল আগে ছেলেবেলায় দেখেছিলো। দিব্যি হাসিখুশি ফুর্তিবাজ মানুষ বলেই তাকে বিল্লুর মনে পড়ে।

যতদূর মনে পড়ে প্রায়ই তাদের বাড়ির রকে বসে সে তখন সাড়ে-

বত্রিশ ভাজা খেতো, খালি গায়ে, মালকোঁচা বেঁধে তাদের সঙ্গে পাশের গলিটায় ডাণ্ডা-গুলি খেলতো। লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেট টানতো, মাঝে মাঝে বিড়িও বাদ যেতো না। মোচার ঘণ্ট, কলায়ের ডাল আর ঝিঙে-পোস্ত হলে দু-তিন থালা ভাত অনায়াসে মেরে দিতো—আর যতদূর মনে পড়ে, জলের গেলাস ধরা সম্বন্ধে হাতের কোনো বাছ-বিছার সে করতো না। জলও যে নিঃশব্দে গিলতো না, এ-কথাটা বিল্লু বাজি রেখে বলতে পারে। তারপর বীরেনদাকে দেখে তার বিয়ের সময়। সবে সে তখন চাকরি পেয়েছে। বৌদির নাম তখন করুণা বলেই জানতো; সিঁদুর-টিপ কপালে, লাল চেলি, বড়-বড় ঘন কালো চুল। বিল্লুর ভারি পছন্দ হয়েছিলো। তার বৌদি বীরেনদাকে তখন নীচু গলায় 'ওগো-হ্যাগো' বলেই ডাকতো।

কিন্তু বছর-সাতেকের মধ্যে এত ওলট-পালট কী করে যে সম্ভব, বিল্লু ভেবে তার কূলকিনারা পেলো না। করুণা-বৌদি কুইনি হয়েছে। সেই কালো লম্বা চুলের বদলে বব্-করা ছোটো-ছোটো ঈষৎ কটা চুল, কপালের সিঁদুর-টিপের বদলে ঠোঁটে কড়া লাল লিপস্টিক, আলতার বদলে হাত-পায়ের নখে ক্যুটেক্স, 'ওগো-হ্যাগো'র বদলে একেবারে বীরেন! তার উপর টেবল-ম্যানার্স, ইংরিজি বুলি, বেয়ারা-বাবুর্চি, নাচের ভঙ্গিতে হাঁটা—প্রথমটায় একেবারে হকচকিয়ে গেলো বিল্লু। একবার লোভ হচ্ছিলো কাউকে কিছু না-বলে বিকেল পাঁচটার ট্রেন ধরে সোজা কলকাতায় পালিয়ে আসার।

যত বিকেল হয়ে আসতে লাগলো ততই ভোজের কথা মনে করে বিল্লুর বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগলো। সমস্ত রাত ট্রেনে ভালো ঘুম হয়নি। ভেবেছিলো দুপুরে টেনে ঘুম দেবে। কয়েকটা ভালো ভালো গল্পের বই এনেছিলো। ভেবেছিলো খানিক পড়বে। কিন্তু একটুও সুযোগ পায়নি সে। সমস্ত দুপুর ধরে বৌদি তাকে টেবল-ম্যানার্স শিখিয়েছে—মাছের জন্য কাজ-করা ছুরি-কাঁটা মাংসর জন্য প্লেন, বাঁ-হাতে গেলাস তোলা, ন্যাপকিন লাগানো, খাওয়া শেষ না হলে

প্লেটের উপর ক্রস করে এবং শেষ হয়েছে বোঝাবার জন্য প্যারালাল করে ছুরি-কাঁটা রাখা, ডান হাতে নাইফ বাঁ হাতে ফর্ক, নিশ্বেস বন্ধ করে ধীরে-ধীরে জল গেলা, বেয়ারা যখন তার বাঁদিকে দাঁড়িয়ে খাবারের প্লেট নিচু করবে খুব সাবধানে নিজের প্লেটে খাবার তোলা, খাবার চিবুবার সময় যাতে দাঁত না কেউ দেখতে পায় তার রহস্য, গাল ফুলিয়ে না খাওয়া, ইত্যাদি হাজার রকম তথ্য।

ভোজ খাওয়াটা আনন্দের বলেই বিল্লুর বরাবর ধারণা। বৌদির কথা শুনতে-শুনতে বিল্লুর মনে হোলো পরীক্ষায় স্কলারশিপ পাওয়া, ফাইন্যাল ম্যাচে স্কোর করা কিংবা ওপ্‌নিং ব্যাটসম্যান হওয়ার চেয়েও দুরূহ কাজ আরো আছে।

সন্ধে আটটায় চক্রবর্তীদের বাড়ি যাবার কথা। বৌদি ছ'টা এবং বীরেনদা সাড়ে-ছ'টা থেকে তোড়জোড় করতে ব্যস্ত। বিল্লুকে বারবার তাগাদা দিয়ে গেছে রেডি হয়ে নেবার জন্য। বিল্লু তার স্যুটকেস খুলে খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবিটা বার করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পরে ফেলেছে, তারপর বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে-বসে অপেক্ষা করছে। তাড়াহুড়োয় পাঞ্জাবির বোতামগুলো বিল্লু আনতে ভুলে গেছে। সে-কথা বললে দাদা-বৌদি আবার পাছে একটা অনর্থক হৈচৈ বাধায় সে-জন্য বিল্লু চুপিচুপি দুটো আলপিন এঁটে কাজ চালিয়ে নিয়েছে। ভোজ-সভার হৈচৈ-তে আলপিনগুলো কারুর নজরে পড়বে না বলেই তার বিশ্বাস। খদ্দরের গান্ধী টুপিটাও সে বার করেছে। কিন্তু ধোপ-ভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে সেটা ঠিক যেন খাপ খাচ্ছে না। সামান্য ময়লা। কলকাতা হলে একটুও সে ইতস্তত করতো না। কিন্তু চক্রবর্তীদের বাড়িতে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডিনারে চলবে কি না সে বুঝতে পারলো না। বৌদি বেরোলে একবার জিগ্‌গেস করে নিতে হবে।

সাড়ে সাতটা নাগাদ দাদা এবং বৌদি বেরোলেন। হায় হায়, এ কী করেছে বৌদি? অমন সুন্দর টুকটুকে মুখটা এত মেহনৎ করে

এমন কুৎসিত কেউ করে? ঠোঁটে যেন টকটকে রক্ত, স্নো-পাউডার আর রুজ মিলিয়ে সমস্ত মুখটা যেন বিলিতি একটা মুখোস, চুলগুলো অজস্র ক্লিপ দিয়ে অদ্ভুতরকম চুড়ো করা, ভুরু আঁকা, চোখের পল্লবগুলোই বা ও-রকম খাপছাড়া বড়-বড় হয়ে গেলো কী করে? শাড়ি পরার এ-রকম অস্বাভাবিক ঢং বিল্লু আগে কোথাও দেখেনি। হাত-কাটা ব্লাউজ, বাঁ-দিকের ঘাড় থেকে ঝোলানো জাফরানি রঙের ব্যাগ। হিল-উঁচু জুতো। হাতে চুড়ি নেই, শুধু বাঁ-হাতের মণিবন্ধে একটা ছোটো হাত-ঘড়ি। আঙুলের নখগুলো বড়-বড়, নতুন সবুজ পালিশ, সম্ভবত সবুজ শাড়িটার সঙ্গে মানাবার জন্য। বৌদির পেছন-পেছন বীরেনদা বেরিয়ে এলো। ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছে সত্য, কিন্তু তার হাব-ভাব দেখলে মনে হয় এই পোশাকের জন্য সে বিশেষ লজ্জিত।

বৌদি বিল্লুকে প্রশ্ন করলো, 'কী রকম মানিয়েছে? চলবে তো?'

'ন্যাশন্যাল ফ্ল্যাগের রঙ সবুজ শাড়িতে', তার অস্বস্তি লক্ষ্য না করেই বৌদি গড়গড় করে বলে চলল—'জাফরানি রঙ ভ্যানিটি ব্যাগে আর শাদা রঙ'—বলে একটা পা বাড়িয়ে শাড়িটা তুলে বৌদি শাদা জুতোটা বার করলো।

বীরেন তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে স্ত্রীর অসমাপ্ত কথাটা শেষ করলো, 'শাদা রঙ তো তোমার মুখটাই! লাভলি দেখাচ্ছে, কী বলিস বিল্লু? কিন্তু কুইনি, ধুতিটা নিয়ে বেজায় ফ্যাসাদে পড়েছি। কিছুতেই কোমরে থাকছে না। কেবলই খসে-খসে পড়ছে। অভ্যেস নেই তো—'

'হারি আপ, তোমার বেল্টটা এঁটে নাও', বিল্লুর বৌদি উত্তর দিলো। বীরেন কাঁচা-কোঁচা সামলাতে-সামলাতে হন্তদন্ত হয়ে আবার ভিতরে ঢুকলো। নিজেদের নিয়েই তারা ব্যস্ত, বিল্লুর দিকে নজর দেবার তাদের সময় নেই। মনে-মনে স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে বিল্লু তার আধ-ময়লা খদ্দরের টুপিটা পরে গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

চক্রবর্তীদের বাড়িতে তখনো বিশেষ কেউ আসেনি। বিল্লুরা

গাড়ি থেকে নামতে চক্রবর্তী স্বামী-স্ত্রী এবং জাপানী কুকুরটা নানা বিচিত্র শব্দে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলো। কুকুর-টুকুর বিল্লু বড়-একটা পছন্দ করে না। তাই পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলো। তার বৌদি আলাপ করিয়ে দিলে। 'মাস্টার রয় বীরেনের ভাই—আমার দেওর না ননদ, বাংলায় কী যেন বলে—ব্রিলিয়্যাণ্ট স্কলার—সেলিং ফর আমেরিকা ভেরি সুন।'

নিজের পরিচয় ও ভবিষ্যৎ শুনে বিল্লু তাজ্জব বনে গেল! আমেরিকায় সে যাবে—ভেরি সুন? কই সে তো শোনেনি, তার বাবা-মাও তো জানেন না!—কিন্তু তাজ্জব হবার তখনো অনেক বাকি। ড্রয়িং-রুমটি বাস্তবিক চমকে দেবার মতো। নানা আলো, ছবি, কুশন, ফুলদানি, রেডিও, চেয়ার, সোফা, পর্দা ইত্যাদিতে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দেয়।

মিসেস চক্রবর্তী বিল্লুর হাত ধরে বললেন, 'ভেরি গ্লাড টু মীট ইউ। বীরেন, ভাইটি দেখছি দারুণ স্বদেশী! গ্যাণ্ডি ক্যাপ, খডর, কিচ্ছু বাকি নেই। কিন্তু বোতামের বদলে আলপিন লাগানোটাও কি কংগ্রেসের ডাইরেকটিভ, অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলে নির্দেশ?'

ঘরে আরো নানা অতিথি-অভ্যাগত ছিলো। সবাই মিসেস চক্রবর্তীর এই 'জোকে' প্রাণ খুলে হাসলো। আর বিল্লুর প্রথম মনে হলো, লক্ষ দৃষ্টির সামনে জো লুইয়ের সঙ্গে বক্সিং লড়তে গিয়ে প্রথম রাউণ্ডেই সে একেবারে লেফ্ট্-আপার-কাট খেয়ে নক-আউট হয়ে গেছে। তার ট্রেনার বীরেনদা আর বৌদি এমনভাবে চাইছে যে মনে হয় এখনি তাদের কোপানলে সে বুঝি ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

কোনো কথা না বলে বিল্লু একটা সোফার কোণ ঘেঁষে বসলো। ততক্ষণে কথার স্রোত অন্যদিকে বইছে। একটু আগে সে আলোচনার বস্তু ছিলো, একটু পরে ঘরের অন্যান্য কিউরিওর সঙ্গে সে যেন মিশে গেছে। তার দিকে কেউ আর চাইলো না, কথাও বললো না। বিল্লু মনে-মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলো।

সোফার সেই কোণে বসে তারপর বিল্লু সবাইকে ভালো করে লক্ষ্য করতে এবং কথাবার্তা শুনতে লাগলো। মেয়েদের সাজ-পোশাক প্রায় একই রকম। রুজ-লিপস্টিক-কুটেক্স, একভাবে সবাই মেখেছে, শুধু শাড়ি, ব্লাউজ, ব্যাগ আর জুতো বিভিন্ন রঙ এবং ঢঙের। পুরুষরা ধুতি পাঞ্জাবিই পরেছে, কিন্তু তার বীরেনদার মতো প্রত্যেকেই যেন সুস্থ বোধ করছে না। অশুদ্ধ বাঙলা উচ্চারণ এবং অশুদ্ধ ইংরিজি ভাষায় প্রত্যেকেই প্রায় কথা বলছে।

'মিসেস ড্যাশ—অ্যাজ ইউজুয়্যাল লেট। তার বাঁকা মুখকে ড্রেস-আপ করতে অনেক সময় লাগে।'

'উডবার্ন আমাকে বলছিলো নেক্সট ইয়ার ক্লীন ছ-মাসের লীভ দেবে। আমি আর মিনি তখন আবার সেই গুড-ওল্ড লণ্ডনে।'

'আই টেল ইউ, বুঢা বোস ওয়্যার-পুলিং জানে। আপনাদের চারজনকে টপকে কেমন ডেপুটির পোস্টটা বাগালো!'

—'মিসেস চক্রবর্তী, ন্যাশন্যাল ফ্ল্যাগ কই, আর মিস্টার গ্যাণ্ডির পোর্ট্রেট?'

—'ওয়েট এ মিনিট, ওয়েট এ মিনিট, ডাইনিং রুমে আগে ঢোকো—'

—'ও মাই গুডনেস, আজ যা বিপদ! একটাও ঢোটি-পাঞ্জাবি নেই। আমার ক্লার্কের কাছ থেকে ধার করে—'

বাসু মোটাসোটা রসিক লোক। সবাই তার কথায় হাসিতে ফেটে পড়লো।

আর বিল্লু সেই সোফার সেই কোণে ময়লা গান্ধী টুপি আর আলপিন-আঁটা পাঞ্জাবি পরে বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগল: এ কোন্ আজব দেশে সে এসে পড়েছে? ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সঙ্গে কোথায় এদের যোগাযোগ? এরা বাঙালীও না, সায়েবও নয়। কোন্ জাত এদের? কী এরা চায়? প্রত্যেকেই পিছনে প্রত্যেকের নিন্দে করে, প্রত্যেকেই প্রমাণ করতে ব্যস্ত, সাহেবরা তাদের কী ভালোবাসে!

এরা ইংরিজি যদি বলতে চায় ভালো করে শেখে না কেন? বাংলাই বা এরকম অশুদ্ধ উচ্চারণ কেন করছে?

অবশেষে ডাইনিং রুমে একে-একে সবাই গেলো। বিরাট টেবিল, নানা কারুকার্য-করা চিনেমাটির বাসন নানা ভঙ্গিতে সাজানো, অনেকগুলো উজ্জ্বল বিজলিবাতি থাকা সত্ত্বেও টেবিলের উপর মোমবাতি বসানো রয়েছে। বিল্লুকে বসতে হোলো মিসেস চক্রবর্তীর পাশে। তার সামনের দেয়ালে মহাত্মাজীর একটি ছবি, তার উপর ছোটো একটি জাতীয় পতাকা। দেয়ালের অন্যান্য জায়গায় নানা বিলিতি ছবি, কোনোটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের, অধিকাংশই নানা জাতীয় কুকুরের। মিসেস চক্রবর্তীর কুকুর-প্রীতির খবর নানা লোকের নানা কথাবার্তায় ইতিমধ্যেই সে জানতে পেরেছে।

এতক্ষণ বিল্লু আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিলো। ঢিপঢিপে বুক তার অজানা নয়—ইস্কুলের দলের ক্যাপ্টেন হয়ে মাঠে নামবার আগে প্রত্যেকবারই হয়েছে। কিন্তু পায়ে বল ছোঁবার সঙ্গে-সঙ্গে সে অন্য মানুষ। তখন তাকে রোখবার ক্ষমতা বিপক্ষ দলের খুব কম খেলোয়াড়েরই থাকে। কিন্তু আজকের খেলাটা ভালো করে খেলতেই হবে তাকে—বিল্লু মনে-মনে ভাবলো। এর উপর শুধু তার নয়, তার দেশের সমস্ত সম্মান নির্ভর করছে। মুহূর্তে তার মন স্থির করে ফেললো বিল্লু।

সবে তখন বেয়ারা স্যুপ দিয়ে গেছে। টেবিলের চারিপাশে চাপা হাসি, কাঁটা-চামচের টুংটাং, ন্যাপকিন খোলার খসখস শব্দ।

মোটাসোটা সেন সায়েব বললো, 'চকরবর্তি, আজ আপনার সেই বিখ্যাত চাইনিজ ডিনার-সেট বার করেছেন দেখছি। এ ফিটিং অকেশন! দেড় হাজার ডলারে কেনা—না?'

'সেভেন্টিন হানড্রেড', যেন একটু লজ্জিত হয়ে শুধরে দিলেন মিসেস চক্রবর্তী।

বিল্লু অকস্মাৎ অত্যন্ত পরিষ্কার উঁচু গলায় প্রশ্ন করলো,

'চক্রবর্তী-বৌদি, সামনের ছবিটা কার?' বলে গান্ধীজির ছবিটার দিকে আঙুল তুললো।

সে যে ঘরে আছে এতক্ষণ কেউই যেন তা লক্ষ্য করেনি! তার পরিষ্কার স্বরে আর-সবাইকার কথা বন্ধ হোলো। বীরেনদা কটমট করে চাইছে। বৌদি লজ্জায় মুখ নিচু করলো।

চক্রবর্তী-গিন্নি একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন ডিয়ার, মিস্টার গ্যাণ্ডির—'

বিল্লু তাড়াতাড়ি বললো, 'মিস্টার নয়, গ্যাণ্ডি নয়, মহাত্মা গান্ধী—তাই তো বলতে চাইছেন?—বাঃ চমৎকার ছবি। কোথায় পেলেন? মহাত্মাজীর বলে আমারও মনে হয়েছিলো, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি। একরাশ কুকুরের ছবির মধ্যে রয়েছে কিনা!

চক্রবর্তী-গিন্নি রঙ বদল করলেন কি না বোঝা গেলো না। এত রঙ মেখেছেন যে তা ভেদ করে স্বাভাবিক রঙ বোঝা অসম্ভব।

বিল্লু আবার তাঁকে বললো, 'কিছু মনে করবেন না বৌদি। কাঁটা-চামচ-ছুরি আমার ধাতে সয় না। ওগুলো দিয়ে খেলে কিছুতেই পেট ভরে না। গেঁয়ো ছেলে কিনা! আমি হাতেই আরম্ভ করছি।'—বলে দু-হাত দিয়ে সুরুয়ার প্লেটটা তুলে অতিরিক্ত শব্দে ঢকঢক করে খেয়ে সশব্দে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলো। তারপর পরম তৃপ্তির সঙ্গে 'আহ্' বলে চুপ হয়ে গেলো।

চক্রবর্তী-গিন্নি একটু নড়ে-চড়ে বসলেন। তাঁর এবং ঘরের অন্য-অন্য অনেকের চোখেই তখন স্পষ্ট একটা আতঙ্কের আভাস। খেলতে নেবেই স্কোর করে যে-তৃপ্তি বিল্লু পায় সেই তৃপ্তি তখন তার মনে।

বেয়ারা পোলাও-এর ডিশ নিয়ে আসতে আবার বিল্লুর ফর্ম খুলে গেলো। একেবারে গোলের সামনে থ্রু-পাস পেলে তার যে-রকম আনন্দ হয়, অনেকটা সে-রকম। সশব্দে কাঁটা-চামচগুলো সরিয়ে চেয়ারের উপর পা তুলে বাবু হয়ে বসে সে বললো, 'বৌদি, পা না

তুলে আমি খেতে পারি না। কিছু মনে করবেন না।—দাও হে বেয়ারা, তুমিই তুলে দাও। তোমাদের ঐ চামচ-টামচ দিয়ে খাওয়া আমার অভ্যেস নেই। একটু বেশি করে দিও, আমার আবার খিদেটা বেশি।…বাঃ, চমৎকার হয়েছে! আবার মুর্গি এনেছ? গ্র্যাণ্ড, গ্র্যাণ্ড!'…অতিশয় ফুর্তি করে সপাসপ বিল্লু খেয়ে চললো।

অন্য সবাইকার তখন বাক্‌রোধ হয়েছে। বীরেন টেবিলের ওপাশ থেকে হাঁকলো, 'বিল্লু—'

বাধা দিয়ে বিল্লু বললো, 'দোহাই বীরেনদা, পেট ভরে খেতে দাও। এখানে আর গার্জেনি কোরো না।'

চক্রবর্তী-গিন্নি তাঁর রুদ্ধ ক্রোধ চেপে বললেন, 'আর-একটু পোলাও তোমাকে দিক?'

মাংসর হাড় চিবুতে-চিবুতে বিল্লু অমায়িক হেসে বললে, 'তা দিক বৌদি। আর ঐ কাটলেট একটা।—গ্র্যাণ্ড রাঁধে আপনাদের ঠাকুর। কোথা থেকে পেলেন? আপনার ট্রেনিং বুঝি? বীরেনদা যা চটছে, বুঝেছেন বৌদি, ভাবছে পেট খারাপ-টারাপ করে আমি একটা কাণ্ডই বুঝি বাধাবো। আসলে কিস্‌সু হবে না। বাড়িতে গিয়ে একটু জোয়ানের আরক খেয়ে নিলেই—'

খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর কেউ বিশেষ কথা বললো না, শুধু বিল্লু ছাড়া। পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে চেয়ারে বাবু হয়ে বসে, টেবিল-ক্লথে মাংসর ঝোল-টোল ফেলে সে এক হৈ-হৈ কাণ্ড! তারপর অন্য সবাইকার খাওয়া শেষ হবার আগেই নিজের খাওয়া শেষ করে জলের গেলাসে হাত ডুবিয়ে, মুখে ভিজে হাত বুলিয়ে, ন্যাপকিনে মুখ-হাত মুছে বিল্লু সশব্দে একটা পরম তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে বললো, 'নাঃ বৌদি, খাওয়াটা যেন একটু বেশিই হয়ে গেলো!'

কিন্তু তখনো ফাইন্যাল স্কোর করতে বাকি। সবচেয়ে ভালো গোলটা এখনও দিতে হবে। বিল্লু অতি সন্তর্পণে তার পাঞ্জাবি থেকে একটি আলপিন খুলে টেবিলের তলায় হাত গলিয়ে চক্রবর্তী-গিন্নির

আঁচলের সঙ্গে টেবিল-ক্লথের একটি কোণ ভালো করে এঁটে দিলো।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'পান? পান আপনারা খান না, না বৌদি? কিন্তু ভোজ খাওয়ার পর পান না খেলে আমার চলে না। আচ্ছা ঠিক আছে। ইস্টিশানেই কিনে নেবো।—হ্যাঁ বীরেনদা, আজ রাতেই ফিরতে হবে। এখন থেকে হাঁটতে শুরু করলে সাড়ে দশটার প্যাসেঞ্জারটা ঠিক ধরতে পারবো। আমার স্যুটকেসটা পারো তো পাঠিয়ে দিয়ো।'

সেই সতেরো-শো ডলারের চিনেমাটির ডিনার-সেটটার দুর্গতি দেখবার সময় তার নেই। চক্রবর্তী-গিন্নির মুখের ভাবটা তখন ঠিক কী রকম হবে কল্পনা করতে করতে বিল্লু ইস্টিশানের পথ ধরলো।

॥ বিলিতি ইঁদুর ॥

বুলটির বিলিতি ইঁদুরগুলো দেখে আমাদের রুনুবাবুর ভারি পছন্দ হয়ে গেলো। ও-রকম ইঁদুর তারও দরকার। সে পুষবে, নিজের হাতে খাওয়াবে তাদের, চাই কি নানারকম খেলাও তাদের শিখিয়ে সবাইকে একদিন তাক লাগিয়ে দেবে। মোটকথা, ও-রকম ইঁদুর তার চাইই চাই। যেমন করে হোক চাই।

আমাদের রুনুবাবু তার কলকাতার মামাবাড়ি থেকে ফিরে তাই একদিন বিকেলে গাল ফুলিয়ে বসে রইলো। তার দাদু এই ফোলা গালের মানে জানেন। বিকেলে বেড়াতে যাবার সময় বাইরের বারাণ্ডায় এইভাবে রুনুবাবুকে গাল ফুলিয়ে বসে থাকতে দেখে, হাতের ছাতা আর লাঠি মেঝেয় নামিয়ে তিনিও তার পাশে বসে পড়লেন, তারপর বললেন, 'রুনুবাবুর মুখ ভার কেন গো? কে বকেছে?'

রুনুবাবু তার ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথা একবার এধারে একবার ওধারে বাঁকিয়ে যেমন বসে ছিলো তেমনি বসে রইলো, উত্তর দিলো না।

পৃথিবীতে কেউই রুনুবাবুর এই মাথা ঝাঁকানোর মানে জানে না, শুধু তার দাদু ছাড়া।

দাদু ঠিক বুঝলেন। বললেন, 'কেউ বকেনি? তবে? তবে কি আমাদের রুনুবাবুর কোনো জিনিস চাই?'

রুনুবাবু আর চুপ করে বসে থাকতে পারলো না। দাদুর ফর্সা শার্ট আর চাদরের মধ্যে মুখ গুঁজে বললো, 'হুঁ। বুলটির ভারি সুন্দর বিলিতি ইঁদুর আছে।'

'এই কথা ? বিলিতি ইঁদুর চাই ? আমি এখনই কলকাতায় লিখে দিচ্ছি। একজোড়া ইঁদুর সাতদিনের মধ্যে এখানে রেলে চেপে চলে আসবে।'

এই না বলে রুনুবাবুর দাদু তাঁর ছাতা আর লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ির ভিতরে গেলেন। পিছন-পিছন রুনুবাবুও এলো। তার দাদু ঘরের কোণে ছাতা আর লাঠি দাঁড় করিয়ে চেয়ারে বসে চোখের চশমা নাকের ডগায় টেনে এনে বিলিতি ইঁদুরের জন্য কলকাতায় চিঠি লিখতে বসলেন।

দিন সাতেক পরে, রুনুবাবুর মাথায় তখন দোলনা চাপার সখ চেপেছে, বিলিতি ইঁদুরের কথাটা প্রায় মনেই নেই—চিঠি এলো, ইস্টিশানে বিলিতি ইঁদুর এসে হাজির হয়েছে, তাদের নিয়ে আসতে হবে।

রুনুবাবুও চললো তার দাদুর সঙ্গে ইস্টিশানে ভোলার কোলে চেপে।

ইস্টিশান মাস্টারও বেশ বুড়ো মানুষ। মাথার সামনে ও পাশে কোথাও একটাও চুল নেই। পিছন দিকের খানকয়েক চুল শুধু বাতাসে উড়ছে। ঘাড় গুঁজে তিনি পেন্সিল দিয়ে খসখস করে কি-সব লিখছিলেন। রুনুবাবুর দাদুর কথা শুনে লেখা থামিয়ে চোখ তুললেন।

'বিলিতি ইঁদুর ?—ও হ্যাঁ, এসেছে বৈকি!' বলে নিজের চেয়ারের পাশ থেকে ছোট একটি খাঁচা তিনি টেবিলের উপর রাখলেন। সেই খাঁচার মধ্যে আটটি ইঁদুর কুট-কুট কুঁই-কুঁই করে ঘুরছে। তাদের মধ্যে দুটিই বড়-সড়, আর ছ'টি নিতান্তই নাবালক।

চশমাটা আবার নাকের ডগায় টেনে এনে রুনুবাবুর দাদু প্রশ্ন করলেন, 'আটটা কেন ? আমি তো দুটো পাঠাতে লিখেছিলুম। দুটো মানে, এক জোড়া।'

ইস্টিশান মাস্টার তাঁর টাক নেড়ে হেসে বললেন, 'আজ্ঞে দুটো তো লিখেছিলেন। কলকাতা থেকে তারা দুটোই পাঠিয়েছিলো; কিন্তু মালগাড়িতে চেপেই সেই দুটোর ছ'টা বাচ্চা হয়েছে—দুই আর ছয়ে আট। এই দেখুন আটটা ঠিকই রয়েছে। এখন আটজনের ভাড়ার টাকা দিয়ে এগুলোকে নিয়ে যান। এক-একজনের ভাড়া পাঁচসিকে করে—আটটার ভাড়া হোলো দশ টাকা।'

রুনুবাবুর দাদু বললেন, 'কক্ষনো না। আমি দুটো চেয়েছিলুম, কলকাতা থেকে তারা দুটোই পাঠিয়েছে। আমি আড়াই টাকা ভাড়া দেবো দুটোর জন্যে—'

'আর বাকি ছ'টার?'

'বাকি ছ'টাকে ফেরত পাঠান।'

'কোথায় পাঠাবো?'

'যারা পাঠিয়েছে তাদের কাছে।'

'তারা যদি ফেরত না নেয়? মানে, ফেরত গেলে তো দু-পিঠের ভাড়া তাদের দিতে হবে। মাথা-পিছু পাঁচসিকের জায়গায় সেটা হয়ে দাঁড়াবে আড়াই টাকা। আর কলকাতায় এই বিলিতি ইঁদুরের দাম—'

'এক-একটা আট আনা করে।'

'তবেই দেখুন। আট আনার জিনিস তারা আড়াই টাকা দিয়ে ফেরত নেবে কেন?'

এবার রুনুর দাদু চটে উঠলেন। বললেন, 'তাই বলে আমাকে বাড়তি ছ'টা নিতে হবে? এ কোন্-দেশি কথা মশাই? আমি দুটো চেয়েছি, দুটোর ভাড়া দিচ্ছি; আমাকে দুটো ইঁদুর দিয়ে দিন। বাকি ছ'টা কলকাতাতেই ফেরত যাক, কি আমেরিকা-বিলেত-চীন-জাপানেই যাক—তার আমি কী জানি?'

'আজ্ঞে আপনি না জানলেও আমাকে জানতে হবে তো? আমি রেলের কর্মচারী। পঁয়ত্রিশ বছর ঐ রেল কোম্পানিতে চাকরি

করছি। এই কোম্পানির দয়ায় আজও আমার পরিবারের ভাত কাপড় জুটছে, ছেলের লেখাপড়ার খরচ আসছে, মেয়ের বিয়ের টাকা জমছে—এই কোম্পানির যাতে লোকসান হয় তা তো আমি হতে দিতে পারি না। আমার কোম্পানি কলকাতা থেকে আটটা ইঁদুর এনেছে। তার পাওনা হচ্ছে দশ টাকা। আপনি আড়াই টাকা দেবেন বলছেন। মানে সাড়ে সাত টাকা কোম্পানির লোকসান। আমি থাকতে এই লোকসান কী করে হতে দিতে পারি মশাই?'

'আপনার কোম্পানির কি এইরকম কোনো আইন আছে যে দুটো ইঁদুরের বদলে আটটা হয়ে গেলে আটটারই ভাড়া দিতে হবে?'

এইবার টাক চুলকে ইস্টিশান মাস্টার বললেন, 'আসলে ব্যাপার কী জানেন মশাই? এ-রকম ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। অন্তত আমার এই পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরে জীবনের মধ্যে এ-রকম ঘটনা এই প্রথম ঘটলো। তাই এ-ধরনের কোনো আইন-কানুন জানা নেই। আইনের কথা যদি বলেন, তাহলে বড়-সাহেবকে লিখতে হবে। বড়-সায়েব যা বলবেন, তাই আইন।'

'বেশ, বড়-সায়েবকে লিখুন। তবে জানবেন মশাই, আমিও হাকিম ছিলুম। একটি পয়সা কেউ ঠকিয়ে নিতে পারবে না। দুটোর জন্যে আড়াই টাকার বেশি একটি পয়সাও দেবো না জানবেন। ইঁদুরগুলো আপনার কাছেই থাকুক ; কিন্তু দেখবেন ওদের খাওয়া-দাওয়ার যদি কোনো রকম অবহেলা হয়, ওদের ঘাড়ের একটি রোঁয়াও যদি নষ্ট হয়, তাহলে রেল কোম্পানিকে কী রকম নাজেহাল করি দেখবেন।'

এই বলে তো রুনুবাবু আর ভোলা চাকরকে নিয়ে গজগজ করতে করতে তিনি বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরে তিনি কিন্তু চুপ করে বসে রইলেন না। কাগজ-কলম নিয়ে বসে দীর্ঘ দু'পাতা ধরে তিনি এক চিঠি লিখলেন রেল কোম্পানির বড়-সায়েবকে।

এক সপ্তাহ পরে সেই চিঠির উত্তর এলো। বড়-সায়েব

জানিয়েছেন, ভাড়া বেশি মনে হলে রেল কোম্পানির 'ক্লেমস ডিপার্ট-মেণ্টে চিঠি দিতে।

ক্লেমস ডিপার্টমেণ্টে রুনুর দাতুর বারো পাতার চিঠি গেলো। দিন-দশেক পরে উত্তর এলো : যেন 'ট্যারিফ ডিপার্টমেণ্টে' দরখাস্ত করা হয়। রুনুবাবুর দাতু আবার ট্যারিফ ডিপার্টমেণ্টে কুড়ি পাতার এক দরখাস্ত লিখলেন।

ট্যারিফ ডিপার্টমেণ্টের বড়-সাহেবের কাছে রুনুবাবুর দাতুর কুড়ি পাতার চিঠি পৌঁছলো। সেই চিঠির সঙ্গে কেরানিরা খোঁজ করে রুনুবাবুর দাতুর আগের চিঠিও একসঙ্গে আলপিন দিয়ে এঁটে বড় সায়েবের টেবিলে পাঠালেন। বড়-সায়েবের ভীষণ তাড়া, সিনেমা দেখতে যাবার জন্যে তিনি তখন তৈরি হচ্ছিলেন। তাঁর অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে তিনি বললেন, 'এত কাগজপত্র কিসের হে?'

'আজ্ঞে বিলিতি ইঁতুরের ভাড়া নিয়ে ফরিদপুরে একটা গোলমাল হয়েছে। যাঁর নামে ইঁতুরগুলো গিয়েছিলো তিনি সব-কটার ভাড়া দিতে চাচ্ছেন না। মাত্র তুটোর ভাড়া দিতে রাজি।'

'তাহলে ফরিদপুর ইস্টিশান মাস্টারকে একটা চিঠি লিখে জানো ব্যাপারটা কী। আর সেইসঙ্গে প্রশ্ন করো ইঁতুরগুলো কেমন আছে, ঠিকমতো খাবার পাচ্ছে কি না।' বলে নেকটাই সোজা করে, মাথায় টুপি চড়িয়ে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

ট্যারিফ ডিপার্টমেণ্টের বড়-সায়েবের চিঠি পেয়ে ইস্টিশান মাস্টার টাক চুলকে তখনি দৌড়োলেন বিলিতি ইঁতুরগুলোর কাছে। ইতিমধ্যে তাদের বংশ আরো বেড়েছে। ছোটো খাঁচায় আর কুলোচ্ছে না। বড়-বড় পাঁচটা প্যাকিং-বাক্সকে খাঁচা করে তিনি ইঁতুরগুলো রেখেছেন। বাঁ হাতে বড়-সায়েবের চিঠি ধরে ডান হাতের একটা আঙুল তুলে তিনি গুনতে লাগলেন, 'এক-তুই-তিন···বাইশ-তেইশ-চব্বিশ···পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ সাঁইত্রিশ···তিরেশি-চুরোশি-পঁচাশি।' তুটির জায়গায় তারা দাঁড়িয়েছে মোট পঁচাশিটিতে।

ইস্টিশান মাস্টার পেন্সিল চুষতে চুষতে একটা চোখ আধখানা বুজে হিসেব করতে লাগলেন তাদের খাওয়াতে মোট কত খরচ পড়েছে। হিসেব করতে-করতে চোখ তাঁর কপালে উঠলো। ইঁদুর হলে হবে কী, তাদের খোরাক ঠিক হাতির মতো। শুধু কপিই খেয়েছে তারা একশো বাইশ টাকার।

ট্যারিফ ডিপার্টমেণ্টের বড়-সায়েবকে ইস্টিশান মাস্টার চিঠি লিখলেন : ইঁদুরের অবস্থা ভালো। বর্তমানে তাদের বংশবৃদ্ধি হয়ে মোট পঁচাশিটিতে দাঁড়িয়েছে। তাদের বংশের সবাইকারই আশ্চর্য খিদে। ইতিমধ্যে শুধু কপিই খেয়েছে তারা একশো বাইশ টাকার।

তারপর পুনশ্চ দিয়ে প্রশ্ন করলেন : তাদের এই খাবারের দাম কি আমি যাঁর নামে চালান এসেছে তাঁর কাছ থেকে আদায় করবো ?

দিন পনেরো পরে উত্তর এলো : নিশ্চয়ই।

ততদিনে খাবার-খরচ মোট হয়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচশো সাতাশ টাকা। ইঁদুর-বংশের সংখ্যা হয়ে গেছে একশো তিপ্পান্ন।

চিঠি পেয়েই ইস্টিশান-মাস্টার ছুটলেন রুনুবাবুর বাড়ি ইঁদুরদের খাই-খরচা দরুন পাঁচশো সাতাশ টাকা আদায় করতে।

রুনুবাবুর দাদু খুব শান্ত হয়েই ইস্টিশান মাস্টারের কথা শুনলেন, তারপর যেন হঠাৎ বিদ্যুতের শক্ খেয়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চোখের চশমা নাকের ডগায় নামিয়ে থর্থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করতে লাগলেন, 'পাঁচশো সাতাশ টাকা ? গেট আউট··· গেট আউট···'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ইস্টিশান মাস্টার বেরিয়ে এলেন। তাঁর চকচকে টাকের উপর বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে। তিনি স্নানাহার না করেই আবার লিখলেন দীর্ঘ এক চিঠি ট্যারিফ ডিপার্টমেণ্টের বড়-সাহেবকে।

বড়-সায়েব তিন মাসের ছুটি নিয়ে তখন বেরিয়ে গেছেন। তাঁর জায়গায় কাজ চালাতে যিনি এসেছেন, তিনি আবার রেল-কোম্পানির

এজেণ্টের শালার ছেলে। চকচকে টেরি কেটে, ভালো-ভালো কোট পেণ্টুলুন পরে তিনি শুধু আপিসে আসেন, সবাইকার সঙ্গে খোসগল্প করেন—কাজের কিচ্ছু জানেন না, জানতেও চান না। তাই হেড-কেরানি যখন ফরিদপুর ইস্টিশান-মাস্টারের চিঠির কী জবাব দেওয়া যায় প্রশ্ন করলো, এজেণ্টের শালার ছেলে বললেন, 'ও-সব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে এখন কাজ নেই। সায়েব ছুটি থেকে ফিরলে জবাব দেওয়া হবে। এখন যেমন চলছে তেমনি চলুক।'

তুচ্ছ বিলিতি ইঁদুর নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে রাজি হলেন না। ফরিদপুর ইস্টিশান-মাস্টার চিঠি পেলেন : যেমন চলছে তেমনি চলুক। কী কর্তব্য পরে জানানো হবে।

যেমন চলছে তেমন চলুক? ইস্টিশান-মাস্টার প্রায় খাবি খেতে লাগলেন। তাঁর আপিস-ঘরের সবটাই এখন ছোটো-বড় নানান-ধরনের প্যাকিং-বাক্সর খাঁচায় ভরে গেছে। ইঁদুরের সংখ্যা হয়েছে আড়াই হাজার। আর সর্বদাই তারা খাই-খাই করে ঘুরছে। যেমন চলছে তেমনি চলুক? তাঁর মাথার পেছনে যে-কটি রোঁয়া ছিলো, সে-কটিও ঝরে গেলো ঐ চিঠি পেয়ে।

মাস-তিনেক পরে ইস্টিশান-মাস্টার ট্যারিফ ডিপার্টমেণ্টের বড়-সায়েবকে টেলিগ্রাম করলেন : অবিশ্বাস্য গতিতে ইঁদুরের বংশ বাড়ছে। কী করবো জানান। সমস্ত ইস্টিশানে আর তিল ধরবার জায়গা নেই। রাস্তার ওপাশের বড়-বড় গুদাম-ঘরও ভাড়া নেওয়া হয়েছে। ইঁদুরগুলো কি বেচে দেবো?

ততদিনে ট্যারিফ-ডিপার্টমেণ্টের বড়-সায়েব ছুটি থেকে ফিরেছেন। টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন : ইঁদুর বিক্রি কোরো না। এরা রেল-কোম্পানির সম্পত্তি নয়। একটুও যেন অযত্ন না হয়।

উত্তরে ফরিদপুরের ইস্টিশান-মাস্টার আবার টেলিগ্রাম করলেন : ঈশ্বরের দোহাই, কিছু একটা করুন। আমি একা আর সামলাতে পারছি না।

তার উত্তরে ইস্টিশান-মাস্টারকে জানানো হোলো : দিন-দশ পরে রেল-কোম্পানির বড়-সায়েবদের নিয়ে একটা মিটিং বসবে। সেই মিটিং-এ এই ইঁদুরের ব্যাপারও আলোচিত হবে। দিন-দশ পরে কী কর্তব্য তার সঠিক নির্দেশ আসবে।

দিন-দশেক পরে রেল-কোম্পানির বড়-সায়েবদের নিয়ে বেশ জমকালো মিটিং হোলো। সেই মিটিং-এ বিশেষ কিছুই ঠিক হোলো না। শুধু ঠিক হোলো অডিট ডিপার্টমেণ্ট যা সাব্যস্ত করবে তাই হবে।

অডিট ডিপার্টমেণ্টের সব ব্যাপারেই একটু দেরি হয়। সমস্ত চিঠিপত্র পড়ে এই ব্যাপারের গোড়া থেকে জানতে তাদের বাইশ দিন কেটে গেলো। ফরিদপুরের ইস্টিশান-মাস্টারকে তারা টেলিগ্রাম করলো : ইঁদুরের সংখ্যা বর্তমানে কত হয়েছে জানাও।

উত্তর আসতে দেরি হোলো না। ফরিদপুরের ইস্টিশান-মাস্টার জানালেন, ইঁদুরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিপ্পান্ন হাজার সাতশো বিরেশিতে।

তার উত্তরে অডিট ডিপার্টমেণ্ট জানালো, ঐ তিপ্পান্ন হাজার সাতশো বিরেশিটি ইঁদুরের ভাড়া মাথা-পিছু পাঁচ সিকে করে হিসেব করলে যত হয়, ঠিক তত টাকা রেল-কোম্পানির পাওনা হয়েছে রুনুবাবুর দাদুর কাছে। এ-ছাড়া ডেমারেজও আছে।

তার উত্তরে ফরিদপুরের ইস্টিশান-মাস্টার টেলিগ্রাম করলেন : বর্তমানে তাদের সংখ্যা আরও বেড়েছে। আজ সকালে গুণে দেখেছি তারা সত্তর হাজারের কাছে পৌঁছেছে। তাছাড়া আজ পর্যন্ত তাদের খাওয়া এবং পরিচর্যার জন্য খরচ হয়েছে উনত্রিশ হাজার টাকা। এখন কী কর্তব্য ?

কিন্তু তার পরের দিন থেকে সেই টাক-ওলা প্রৌঢ় ইস্টিশান মাস্টারের পক্ষে আর কোনো চিঠিপত্র পড়া কিংবা রেল কোম্পানির কোনো কাজ করা সম্ভব হোলো না। ভোর থেকে মাঝ-রাত পর্যন্ত

কাটতে লাগলো তাঁর বিলিতি ইঁদুরের পরিচর্যা করতে। তারা সংখ্যায় কত কে বলবে? সমস্ত ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্ম প্যাকিং বাক্সর খাঁচায় ভরে গেছে, ইস্টিশান মাস্টারের ঘরেও আর তিল ধরবার জায়গা নেই। রাস্তার ওপাশের পাশাপাশি সাতটা বড়-বড় গুদাম খাঁচায় ঠাসা হয়েছে। পোড়ো জমিতে কাঠের একটা বড় গোলা বসেছে, রাতদিন তারা শুধু প্যাকিং বাক্স কেটে খাঁচা বানাতে ব্যস্ত; তার পাশেই বসেছে হাট। ফরিদপুরের কাছে-পিঠে যত রকমের শাকসব্জী হয়, এমনকি ঘাস পর্যন্ত সেই হাটে লোকে বেচতে আসছে। ইঁদুরগুলোর কোনো-কিছু খেতেই আপত্তি নেই। আপত্তি শুধু মুখ কামাই যাওয়ায়। খাবার না থাকলে তারা খাঁচা কাটতে আরম্ভ করে। খাঁচা থেকে একটি ইঁদুর পালালেই বড়-সায়েবের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ইঁদুররা যাতে খাঁচা কাটতে কখনো প্রবৃত্ত হতে না পারে, তার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা তাদের মুখের কাছে খাবার ধরা হচ্ছে। ধরছেন ইস্টিশান-মাস্টার আর ইস্টিশানের সমস্ত কুলি মিলে; তারাও পেরে উঠছে না। বাইরের আরো তিরিশ জন লোক এর জন্য বহাল করা হয়েছে।

অডিট ডিপার্টমেণ্ট তাদের শেষ চিঠির জবাব না পেয়ে আবার চিঠি দিলো। কিন্তু উত্তর দেবে কে? চিঠিটা ডাকের ঝুলির মধ্যে যেমন পড়ে ছিলো, তেমনি রইলো। আবার একটা চিঠি এলো অডিট ডিপার্টমেণ্ট থেকে। তারও কোনো উত্তর নেই। আবার একটা চিঠি এলো। এবং তারও কোনো উত্তর না পেয়ে এলো টেলিগ্রাম।

ইস্টিশান মাস্টার কোনো রকমে টেলিগ্রামটা পড়বার সময় পেলেন। অডিট ডিপার্টমেণ্ট লিখছে: বিলিতি ইঁদুরের ব্যাপারে ভুল হয়েছে। শুধু দুটোর দাম আড়াই টাকা নাও আর সমস্ত ইঁদুরগুলোকেই দিয়ে দাও ঐ ভদ্রলোককে।

কিন্তু দেবেন কাকে? রুনুবাবুর বাড়ি গিয়ে তিনি দেখেন বাড়িটা খালি। তারা সবাই নাকি মাস-তিনেক আগে কলকাতায় ফিরে গেছে।

ঘাম মুছে হন্তদন্ত হয়ে আবার ইস্টিশানে ফিরলেন তিনি। ফিরে দেখলেন, এই সময়টুকুর মধ্যেই দেড় হাজার নতুন বিলিতি ইঁদুর ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

এক মুহূর্তও দেরি না করে তিনি অডিট ডিপার্টমেণ্টকে টেলিগ্রাম করলেন : আড়াই টাকা আদায় করা গেলো না। ভদ্রলোকেরা তিন মাস আগে ফরিদপুর ছেড়ে চলে গেছেন।

অডিট ডিপার্টমেণ্ট থেকে উত্তর এলো : ইঁদুরগুলোকে তাহলে এখনি এখানে ফেরৎ পাঠাও।

টেলিগ্রাম পেয়েই ইস্টিশান মাস্টার লাফিয়ে উঠে তখনই কাজ শুরু করে দিলেন। দেখতে-দেখতে মালগাড়ির পর মালগাড়ি ভরে উঠতে লাগলো, পরে সেগুলো চললো কলকাতায় রেল কোম্পানির হেড-আপিসে। ফরিদপুর থেকে কলকাতা প্রত্যহ বয়ে চললো বিলিতি ইঁদুরের স্রোত ; তবু তারা শেষ হয় না।

এক সপ্তাহ পরে টেলিগ্রাম এলো : বিলিতি ইঁদুর পাঠানো থামাও। উত্তরে ফরিদপুরের ইস্টিশান মাস্টার জানালেন : দুঃখিত। এখন থামা অসম্ভব।

মালগাড়ি ভরে-ভরে যেমন তিনি পাঠাচ্ছিলেন সেইভাবেই পাঠিয়ে চললেন। হিসেব করে তিনি দেখলেন, এইভাবে পাঠাতে থাকলে আরো পাঁচদিনের মধ্যে সবগুলোকে কলকাতায় ফেরৎ পাঠাতে পারবেন—সবগুলো মানে, যেগুলো রয়েছে এবং ঐ আগামী পাঁচদিনের মধ্যে যেগুলো জন্মাবে সেগুলোকেও।

রেল কোম্পানির এজেণ্ট, ট্যারিফ ডিপার্টমেণ্টের বড়-সায়েব, ক্লেম্স্ ডিপার্টমেণ্টের বড়-সায়েব, অডিট ডিপার্টমেণ্টের বড়-সায়েব প্রত্যেকেই কাকুতি-মিনতি করে ফরিদপুরের ইস্টিশান মাস্টারকে ক্রমাগত টেলিগ্রাম করতে লাগলেন নিরস্ত হবার জন্য। তাঁরা জানালেন, ইঁদুরগুলোর জন্য তাঁদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। হঠাৎ অত খাবার জোগাড় করতে না পারায় কতকগুলো ইঁদুর প্যাকিং বাক্স

কেটে বেরিয়ে পড়ে আপিসের চেয়ার টেবিল, দোয়াত কলম, ইলেকট্রিক পাখা, দামি-দামি ফাইল কাগজ-পত্র খেতে শুরু করে দিয়েছে। এজেন্টের শালার ছেলে ইতিমধ্যে দুপুরে আপিসে একদিন ঘুমোচ্ছিলো। হঠাৎ জেগে উঠে সে দেখে, কতকগুলো ইঁদুর তার পেন্টুলুনটা পুরো খাওয়া শেষ করে নেকটাইয়ের অর্ধেকটা পর্যন্ত প্রায় শেষ করে এনেছে।

কিন্তু ফরিদপুরের সেই টাক-মাথা ইস্টিশান মাস্টারের মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। থামা? অসম্ভব! জান কবুল, যেমন করেই হোক, এই পাপ হেড-আপিসে চালান দিয়ে তবেই তিনি থামবেন।

পঞ্চম দিন সন্ধেবেলা স্পেশাল ট্রেনে চেপে হেড-আপিসের সমস্ত বড়-সায়েবরা ফরিদপুর এসে হাজির। তাঁরা সবাই মিলে এসেছেন, ইস্টিশান মাস্টারকে যদি কোনোমতে থামানো যায়।

তাঁদের দেখে একমুখ হেসে ইস্টিশান মাস্টার এগিয়ে এলেন। কতদিন পরে আজ তিনি হাসতে পারলেন, নিজেই সে-কথা জানেন না।

সব বড়-সায়েবরা একসঙ্গে বলতে শুরু করলেন, 'বিলিতি ইঁদুর...'

তাঁদের সবাইকে বাধা দিয়ে ইস্টিশান মাস্টার দূরে আঙুল তুলে দেখালেন: একটা মালগাড়ি প্রায় অদৃশ্য হয়ে এসেছে। তারপর আবার মধুর হেসে বললেন, 'ঐ গাড়িতেই আজ সমস্ত বিলিতি ইঁদুর পাঠানো শেষ হোলো। গরিবের বাড়িতে দয়া করে আপনারা আসুন। এসে একটু চা জল-খাবার খান।'

॥ ছেলেটা ॥

লুচি, বেগুন-ভাজা, মিষ্টি ইত্যাদি সাজিয়ে মা বললেন, 'লক্ষ্মী ছেলে আমার ! খেয়ে ফেলো বাবা !'

কিন্তু মনির ঐ এক গোঁ ! কিছুতেই সে খাবে না। বললো, 'আমার চিংড়ি-মাছের কাটলেট কই ? চিংড়ি-মাছের কাটলেট না দিলে খাবো না।'

'তাড়াতাড়িতে ভুলে গেছি, বাবা। দেখলি তো, জিনিস-পত্র বাঁধাবাঁধির কতো হাঙ্গামা ! মাথা কি আর ঠিক থাকে ! দিল্লি পৌঁছে যা খেতে চাইবি তাই করে দেবো। এখন খেয়ে নে।'

'না আমি খাবো না। কাটলেট না দিলে কিছুতেই খাবো না। কেন দেবে বলেছিলে ?'

'লক্ষ্মী ছেলে আমার। তুমি তো সব বোঝো ! কত বড় হয়ে গেছো। এখন কি আর বায়না করে ? লোকে নিন্দে করবে যে ! নাও, খেয়ে নাও।'

মনির মুখখানা কেঁদে-কেঁদে ফুলে গেছে। তার বয়েস তেরো বছর। দিব্বি বড়-সড় ছেলে। সত্যিই এ ধরনের ছেলেমানুষী বায়না করার বয়েস তার নেই। তবু ভারি সে বায়নাটে, মায়ের ভীষণ আদুরে। কিছুতেই সে গোঁ ছাড়লো না। কাটলেট সে খাবেই। যেখান থেকেই হোক কাটলেট তাকে জোগাড় করে দিতেই হবে। নইলে কিছুতেই খাবে না।

টুটু তার চেয়ে অনেক ছোটো। কিন্তু ছোটো হলে হবে কি, বায়না-টায়না সে করে না। সত্যিকারের লক্ষ্মী মেয়ে সে। নিজের

প্লেট থেকে আলুর-দম দিয়ে লুচি খেতে-খেতে বললো, 'খেয়ে নাওনা দাদা। কেন মাকে জ্বালাতন করছো!'

মনি তাকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলো। তারপর আবার সেই নাকি সুরে আরম্ভ করলো, 'না আমি খাবো না। কিছুতেই খাবো না। কাটলেট না দিলে কক্ষনো খাবো না!'

তার বাবা পাশের বার্থে জানলার ধারে বালিসে হেলান দিয়ে গল্পের বই পড়ছিলেন। মুখে লম্বা পাইপ। কড়া তামাকের গন্ধ সেই ফার্স্ট ক্লাস কামরার ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে। সন্ধে হয়ে গেছে বলে তাঁর মাথার কাছের ইলেকট্রিকের ছোটো আলোটা জ্বালানো। কামরার অন্য আলোগুলো এবার জ্বালাতে হবে, নইলে অস্পষ্ট গোধূলির আলোয় ভিতরের জিনিস ভালো করে নজরে পড়ে না।

মনির সেই ঘ্যানঘেনে বায়নায় বিরক্ত হয়ে তিনি বই নামিয়ে উঠে বসলেন। বোধহয় জোরে ধমকাতেই যাচ্ছিলেন। এমন সময় দেখতে দেখতে ট্রেনের গতি কমে এলো। ইস্টিশান নেই, কেউ নেই, ট্রেন থামে কেন? জানলার বাইরে তিনি চাইলেন ব্যাপারটা কী দেখতে।

টুটু প্রশ্ন করলো, 'এবার কী ইস্টিশান বাবা? বর্ধমান এলো নাকি?'

ততক্ষণে ব্যাপারটা তিনি বুঝে নিয়েছেন। বললেন, 'না রে, বর্ধমান এখনো দেরি আছে। সেই দামোদরের বন্যার কথা বলছিলুম না, এইখান থেকে সেটা শুরু হয়েছে। ট্রেনের লাইন-টাইন সব উপড়ে ফেলেছিলো নদীর জল। আবার নোতুন করে রাস্তা তৈরি হচ্ছে, লাইন বসানো হচ্ছে। তাই খুব আস্তে আস্তে এখন চলবে। ঘণ্টা-খানেক লাগবে জায়গাটা পেরুতে।'

'বা-রে মজা!' টুটু বললো। 'কেমন দেখতে-দেখতে যাবো। ওমা, গাড়ি যে একেবারে গোরুর গাড়ির মতো চলেছে! বাবা,

তোমার পাশে বসে দেখবো।' বলে খাওয়া শেষ করে, খালি প্লেটটা মা'র হাতে দিয়ে টুটু গিয়ে বসলো তার বাবার পাশে।

মা বললেন, 'মনি, তুইও খেতে-খেতে বসে ছাখ না! অতো বায়না কি করতে আছে? ছিঃ! টুটু তোর চেয়ে কত ছোটো, ছাখ তারও কত বুদ্ধি। তুই শুধু বোকার মতো না-খেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে চলেছিস। লোকে দেখলে কী বলবে বল্ তো?'

ঘ্যানঘ্যান করতে-করতে তবুও মনি বললো, 'না আমি খাবো না, না আমি খাবো না!'

মা বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'বেশ, আমিও খাবো না। আমার কষ্ট হলে তো তোর কোনো কষ্ট হয় না!'

তাদের বাবা এবারে ভারি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ছেলেটা একেবারে বাঁদর হয়ে উঠেছে। আদর দিয়ে-দিয়ে তুমি ওর মাথাটা খেলে। দিল্লি থেকে বেড়িয়ে ফিরেই ওকে আমি কোনো বোর্ডিং-এ ভর্তি করে দেবো। দেখি তাতে শোধরায় কি না। উঠতে বেত আর বসতে বেত না খেলে সোজা হবেনা এই ছেলে।'

শুনে মনির শোক আরো উথলে উঠলো। এতোক্ষণ মিইয়ে মিইয়ে কাঁদছিলো, বাবার বকুনি আর বোর্ডিং-এর বিভীষিকায় এবারে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো। নাকের জল আর চোখের জল মিলে মুখটা কুঁচকে-তুবড়ে তাকে বিশ্রী দেখাচ্ছে।

এমন সময় চেঁচিয়ে উঠলো টুটু, 'এই, এই! ছাখো বাবা ছাখো! ছেলেটা মরবে পড়ে!'

তার বাবা জানলা দিয়ে ঝুঁকে বাইরে তাকালেন। মা-ও পাশের জানলা দিয়ে টুটুর সঙ্গে মুখ বাড়ালেন। সূর্যাস্ত অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। পশ্চিম আকাশের মেঘে এতোক্ষণ গোলাপি আলো লেগে ছিলো, সেটাও মুছে গেলো। আরো একটু উপরকার মেঘে সূর্যের কোনো আলো না থাকায় সেগুলো কালো-কালো ভাঙা-ভাঙা পাথরের মতো দেখাচ্ছে। অন্ধকার বেশ জমে এসেছে। জানলা

দিয়ে বাইরে চাইলে মাটি আর আগাছা আর ধোঁয়া মিলে একটা জমা-বাঁধা ধূসরতা ছাড়া আর কিছুই ভালো করে বোঝা যায় না। সামনের ইঞ্জিন থেকে মাঝে-মাঝে যে-সব জ্বলন্ত কয়লা লাইনের পাশে ছিটকে পড়ছে সেই সেই ছোট্ট-ছোট্ট লালচে আলো মাঝে-মাঝে পড়ছে নজরে। আর দেখা যাচ্ছে ত্রিপল আর হোগলার ছোটো-ছোটো ছাউনি। অনেকটা তাঁবুর মতো দেখতে। যারা লাইন সারাবার কাজ করছে এই সব ছাউনিতে তারা থাকে। ছাউনিগুলোর বাইরে খোলা জায়গায় পাথরের উনুন। সেখানে কাঠের আঁচে মাটির হাঁড়ি চড়ানো। মজুরদের রাত্রের খাবার তৈরি হচ্ছে। মেয়েরা কোলে ছোটো-ছোটো ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়ে, ছোটো করে শাড়ি পরা। ছেলেগুলোর গা খালি, তারা ট্রেন দেখছিলো। অনেক মজুর লাইন সারাবার কাজ করছিলো। ট্রেন দেখে তারা লাইনের পাশে শাবল-গুলো হাতে নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। কেউ-কেউ শাবলে ভর দিয়েও রয়েছে।

টুটু কিন্তু তাদের দেখে চেঁচিয়ে ওঠেনি। সে আর্তনাদ করেছিলো অন্য একটা ছেলেকে দেখে। তাদের কামরার পা-দানিতে ছেলেটা লাফিয়ে উঠে দিব্বি চলেছে!

'নাম নাম, পড়ে মরবি যে!' বললেন টুটুর মা।

'না, ওকে নামতে বোলো না। নামতে গেলেই হয়তো টাল সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়বে। বরঞ্চ দরজাটা খুলে দাও। ভেতরে আসুক। পরের ইস্টিশানে নামিয়ে দিলেই চলবে।' বললেন টুটুর বাবা।

কিন্তু যাকে নিয়ে এতো উত্তেজনা ও আলোচনা তার এতোটুকু মানসিক বিকৃতি নেই। সে যেন মজা পেয়ে গেছে। কামরার এতোগুলো ভীত সন্ত্রস্ত চোখের সামনে নিজের বাহাদুরি আরো ভালো করে দেখাতে চায়। এতোক্ষণ সে দু-হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে ছিলো। এবার হিহি করে হেসে এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে একটা হাত বাইরের

বাতাসে মেলে ধরলো, পা-দানি থেকে একটা পাও বাড়িয়ে দিলো বাইরে। এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসতে লাগলো, 'হি-হি-হি।'

ইতিমধ্যে টুটুর মা কামরার দরজাটা খুলে ফেলেছেন। ছেলেটাকে বললেন, 'ভেতরে আয়।'

'ক্যানে? ভেতরে আসবো ক্যানে?'

টুটুর বাবা ধমকে বললেন, 'ভেতরে আয় বলছি।'

তাঁর গম্ভীর স্বর আর ভারী চেহারা দেখে ছেলেটা কেমন যেন ঘাবড়ে গেলো। ট্রেনটা তখন একটা সাঁকোর উপর দিয়ে চলেছে। পাশে লাফিয়ে পড়া যায় না। তাই সে আর কোনো কথা না বলে ভিতরে এলো। তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিলেন টুটুর মা।

ততক্ষণে টুটু সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে ফেলেছে। সমস্ত কামরা বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে। এতোক্ষণে ভালো করে ছেলেটাকে দেখা গেলো। পরনে ছিটের হাফপ্যাণ্ট, গায়ে একটা গেঞ্জি। গেঞ্জির বুক-পিঠ ছিঁড়ে-ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ময়লা কুটকুটে। খালি পা। ধুলো আর কাদায় একাকার। চুলে তেল নেই। ধুলোয় প্রায় জট পাকাবার জোগাড়। বাঁ পায়ের একটা আঙুল ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে জড়ানো আর বাঁ হাতে রয়েছে একটা গুলতি আর মরা একটা পাখি। পাখিটার ডানাগুলো ছেঁড়া-ছেঁড়া, বুকের উপরকার ধুলো-রঙের পালকের উপর রক্ত শুকিয়ে প্রায় কালো হয়ে গেছে। এমন ভাবে পাখিটাকে সে ধরেছে, যেন সেটা ন্যাকড়ার তৈরি।

কামরার ভিতরকার উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোয় এতগুলো ভালো-জামাকাপড়-পরা পরিষ্কার চেহারার ভদ্রলোকের সামনে পড়ে ছেলেটা প্রথমে যেন থতমত খেয়ে গেলো। দরজার পাশের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখতে লাগলো তাদের।

টুটুর বাবা বললেন, 'পা ফসকে পড়লে মরতিস যে।'

ততক্ষণে ছেলেটা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছে। বললো, 'ইস! পড়তুম বৈকি! রোজ যাই, আর আজ পড়তুম! ইস্!'

'রোজ যাস কিরে? কোথায় যাস?' প্রশ্ন করলেন টুটুর মা।

'ক্যানে, সকাল থেকে পাখি মারতে-মারতে চলি আর সাঁঝ হলেই এই ট্রেনে চেপে ফিরি।'

'কোথায় ফিরিস? তোর গ্রাম কোথায়?'

'ওই হুথায়—,' বলতে গিয়ে ছেলেটা থেমে গেলো। তারপর বললো, 'ইস! গ্রামের নাম বলি আর তুমরা পুলিশ ডাকো!'

হেসে টুটুর মা বললেন, 'দারুণ স্যায়না তো!—হ্যাঁরে তোকে পুলিশে দিয়ে আমাদের কী লাভ হবে?'

'সে কথা তুমরাই জানো!' বলে বাঁ থেকে ডান পায়ে ভর দিয়ে আলগা হয়ে ছেলেটা দাঁড়ালো, তারপর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তাদের জিনিসপত্রগুলো দেখতে লাগলো।

'আচ্ছা, গ্রামের নাম না-হয় নাই বললি। বাড়িতে তোর কে আছে? এ-রকম করে ঘুরে বেড়াস, কোন্‌দিন যে ট্রেনে কাটা পড়্‌বি। কেউ খোঁজ রাখে না?'

'ইস্! কাটা পড়বো আর কি!'

'আচ্ছা, কাটা না-হয় না-ই পড়বি। কিন্তু বাপ-মা তোর খোঁজ করে না? তোর জন্যে ভাবে না?'

'বাপ-মা আবার ভাববে কী করে গো! তারা যে স্বগ্‌গে গেছে।' ছেলেটা খুব সহজে বললো, তারপর আবার তাদের জামা-কাপড় জিনিসপত্র কৌতূহলী চোখ মেলে দেখতে লাগলো।

একটু থতমত খেয়ে চুপ করলেন টুটুর মা। ছেলেটা কিন্তু তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করলো না। দেখা শেষ করে আবার বলতে শুরু করলো, 'সেই যে ঝড় হোলো আর বান ডাকলো—তাতে বাপ-মা ভাই বোন গোরু-বাছুর সব ভেসে গেছে। আমি মামার কাছে ছিলুম কিনা, তাই ভেসে যাইনি।'

'তোর মামী নেই ?'

'মামী থাকবেনা কি গো! মামী আছে, মামা আছে, দুটো ছেলে আছে, ছাগল আছে, গোরু আছে, জমি আছে—উই গাঁয়ে সব আছে।'

হেসে টুটুর মা বললেন, 'তা তো বুঝলুম। কিন্তু তুই যে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত টো-টো করে বেড়াস সেজন্যে তারা ভাবে না ?'

আশ্চর্য হয়ে ছেলেটা বললো, 'ভাববে আবার কী গো! মামী বলে দিয়েছে আমাকে আর খেতে দেবে না। বলেছে ভিক্ষে করে চাল আনতে। ভিক্ষে মাগতে লজ্জা করে। তাই পাখি মারি। রাতে আগুনে ঝলসে খাই।'

মনি এতোক্ষণ চুপ করে শুনছিল। বললো, 'মাগো, কী নিষ্ঠুর! হ্যাঁরে, পাখি মারতে তোর কষ্ট হয় না ?'

তাকে ভেংচে ছেলেটা বললো, 'হ্যাঃ! আমি কি মেয়েলোক ?'

'কেন, ছেলেদের কি কষ্ট হতে নেই ? আমার তো কষ্ট হয়।'

'ক্ষিদে পেলে আরো কষ্ট হয়,' বলে ছেলেটা সস্নেহে মরা পাখিটার দিকে চাইলো।

খাবার কথায় মনির মা'র আবার কথাটা মনে পড়লো। বললেন, 'নে মনি, শুনলি তো ? গরিব লোকেরা খেতে পায় না, তাদের কত দুঃখু। আর তোর মুখের কাছে খাবার তুলে দিচ্ছি, সে খাবার তুই ছুঁড়ে ফেলছিস। জানিস, এতে লক্ষ্মী রাগ করবেন।'

আবার সেই ঘ্যানঘ্যানে সুরে মনি বললো, 'না আমি খাবো না। কাটলেট না দিলে কিছুতেই খাবো না।'

টুটু বললো, 'মা, ওকে কিছু খাবার দাও না! আহা, বেচারা সমস্ত দিন খায়নি।'

ছেলেটা চুপ ধরে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিলো আর অবাক হয়ে ভাবছিলো এতো সুন্দর-সুন্দর খাদ্য কী করে লোকে না-খেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু টুটুর কথায় যেন তার চমক ভাঙলো। একটু রেগে

উঠেই বললো, 'না, খাবার আমার চাই না। ক্যানে, আমি কি ভিখিরি ?'

মনি চোখমুখ পাকিয়ে উত্তর দিলো, 'এঃ, বড় তেজ যে! তুই ভিখিরি নোস তো কি লাটসায়েব ?'

'খবরদার বলছি! গালাগালি কোরো না!' বলেই প্রায় তেড়ে এলো ছেলেটা। মনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। তার মা'র কাছ ঘেঁষে বসে কি যেন একটা কথা বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু দেখলো তার বাবা পাইপ নামিয়ে কটমট করে তার দিকে চেয়ে রয়েছেন। ফলে ভয় পেয়ে সে কেঁদে ফেললো। কিন্তু কোনো কথা বলতে সাহস করলো না।

টুটুও অবাক হয়ে গিয়েছিলো। এ কেমন-ধারা খাপছাড়া ছেলে! সকাল থেকে কিছু খায়নি, অথচ খাবার দিতে গেলে যেন তেড়ে মারতে আসে! একবার তার ইচ্ছে হোলো ছেলেটাকে আর-একবার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে খেতে। কিন্তু কাজ নেই বলে! যা গোঁয়ার আর যা পাগল-পাগল চোখ!

এমন সময় ইঞ্জিনের বাঁশি শোনা গেলো। ছেলেটা দেয়াল ছেড়ে জানলা গলিয়ে মুখ বার করে ঝুঁকে কী যেন দেখলো। তার-পর ফিরে এসে আবার দাঁড়ালো।

টুটুর মা বললেন, 'হ্যাঁরে, আমি তো তোর মা'র মতন। আমি বলছি তোকে খেতে। খাবি না ?'

'আমার মা'র মতন তুমি হতে যাবে ক্যানে ?' বলে ছেলেটা হাসলো। 'আমার মা তোমার চেয়ে অনেক ময়লা ছিলো। তোমার মতো ভালো কাপড় কোনোদিন পরেনি। জুতো ছোঁয়নি। আমার মা'র মতন কি আর সবাই হতে পারে ? আমার মা স্বগ্গে গেছে!'

আবার ইঞ্জিনের বাঁশি শোনা গেলো। ছেলেটা এবার কিন্তু জানলার কাছে গেলো না। এক লাফে মনির কাছে এসে ঠাস করে তার গালে চড় বসিয়ে দিলো, তারপর মনির সামনেকার প্লেট থেকে

এক-খাবল লুচি আর আলুর দম তুলে কামরার দরজা খুলে চক্ষের নিমেষে ঝুপ করে নেমে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো !

খারাপ পথ শেষ হওয়ায় বাঁশি বাজিয়ে আবার ক্রমশ জোরে চলতে শুরু করেছে ট্রেন। জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালে সেই ছোটো-ছোটো অস্পষ্ট ছাউনি চোখে পড়ে। উনুনে লাল আগুন জ্বলছে। উপরে হাঁড়ি চড়ানো।

॥ সিগারেট কেস ॥

আমার বন্ধু সত্যসিন্ধু পাকড়াশি মস্ত ডিটেকটিভ। কে না তাঁর কথা জানে! কিন্তু তাঁকে আমার বন্ধু বললে কমিয়ে বলা হবে। তিনি আমার গুরু। এবং তিনি আমাকে দয়া করে তাঁর বাড়িতে যেতে দেন, আমার সঙ্গে কথা বলেন—এ সবই তাঁর নিজের মহত্ত্ব এবং উদারতার পরিচয় ছাড়া আর কী? আমার মতো নিতান্ত সাধারণ লোকের প্রতি তাঁর এই করুণা এবং দয়ার কথা এক-একবার যখন গভীরভাবে ভাবি তখন বিস্ময়ে গলার কাছটা আমার আটকে আসে।

প্রায়ই আমি সত্যসিন্ধুবাবুর বাড়িতে যাই। তাঁর বাড়িতে আমার অবারিত দ্বার। সেদিন সন্ধেতেও তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখি তিনি সেই পরিচিত ইজিচেয়ারটায় শুয়ে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না ভেবে তাঁর কাছের চেয়ারটায় আমি চুপচাপ বসে পড়লুম।

কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়িয়ে কে যেতে পারে?

আমি বসবার পরেই সেই শান্ত গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, 'বাইরে বৃষ্টি পড়ছে।'

বৃষ্টি অবশ্য বাইরেই পড়ে। সেটা কোনো আশ্চর্য খবর নয়। কিন্তু তিনি জানলেন কেমন করে? তবে কি তিনিও এইমাত্র বাইরে থেকে ফিরলেন?

'আপনি বাইরে গিয়েছিলেন তাহলে?' আমি প্রশ্ন করলুম।

'না,' তিনি বলে চললেন, 'তোমার জামাটা খানিক ভিজেছে, তোমার জুতোটাও ভেজা দেখছি, তোমার ছাতা দিয়েও টপটপ করে জল পড়ছে।'

তাঁর এই গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি দেখে আবার আমি নোতুন করে

বিস্মিত হলুম। বিস্ময়ে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এলো! আবার তিনি নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সুরেই বললেন, 'তাছাড়াও বৃষ্টির শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। তুমিও চেষ্টা করলে পাবে। শোনো।'

অবাক হয়ে শুনতে লাগলুম। সত্যি বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে: ঝমঝম ঝমঝম ঝমঝম। বাস্তবিক সত্যসিন্ধুবাবুর কাছে কিছুই এড়িয়ে যেতে পারে না।—কী পর্যবেক্ষণ শক্তি, কী অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ শক্তি!

'আপনাকে যেন খুব চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে?' আমি তাঁর গম্ভীর হালচাল দেখে প্রশ্ন করলুম, 'আবার কোনো জটিল রহস্যভেদের ভার নিয়েছেন নাকি?'

বাঁ পায়ের উপর ডান পা তুলে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, মানে তেমন কিছু নয়। খঞ্জনগড়ের মহারাজের হীরের মুকুটটা চুরি গেছে, কোটিপতি শীলাদিত্যের স্ত্রীর গলার সতেরো লক্ষ টাকার মুক্তোর নেকলেসটা পাওয়া যাচ্ছে না, বোম্বাই-এর টোপিওলাকে কে বা কারা খুন করে গেছে—এই সব নানা তুচ্ছ তদন্তের ভার আমার ঘাড়ে সবাই চাপিয়েছে।' একটু থামলেন সত্যসিন্ধুবাবু, তারপর অকস্মাৎ ইজিচেয়ারের হাতল থেকে তাঁর পা দুটো নামিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাঁর সেই বিশিষ্ট ভঙ্গীতে বসে তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, 'কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা কী জানো? আমার বাড়ি থেকে আমার সিগারেট কেসটা চুরি গেছে! কে এই দুঃসাহসের কাজ করতে পারে ভেবে নিশ্চয়ই তুমি অবাক হচ্ছ! কিন্তু কথা হলো সত্যিই সিগারেট কেসটা আর নেই—একেবারে উবে গিয়েছেও বলতে পারো।'

'চুরি? আপনার বাড়ি থেকে চুরি?' আমার চেয়ারের হাতলটা টা মুঠো করে ধরে বিস্ময়ে আমি হাঁ হয়ে গেলুম।

'হ্যাঁ। মন দিয়ে শোনো। পৃথিবীতে একমাত্র তোমার কাছেই আমার কথা বলি ' একমাত্র তুমিই আমাকে কতকটা জানো।

একমাত্র তুমিই বছরের পর বছর নিজের ডাক্তারি প্র্যাকটিস অবহেলা করে আমার সঙ্গে সর্বদা থাকো। তুমি নিজের সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার জীবনকে কেবল আমার জন্যে উৎসর্গ করেছো বলেই তোমাকে আজ সব কথা খুলে বলছি।'

কৃতজ্ঞতায় আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এলো। সত্যসিন্ধুবাবু তা লক্ষ্য করে বললেন, 'এই নাও একটা সিগারেট ধরাও।'

কুণ্ঠিত স্বরে বললুম, 'ও আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

কেন? কী করে বলি তাঁর কাছে সময়ে-অসময়ে আসার জন্য লোকে ডাকতে এসে আমাকে বাড়িতে পায় না। ফলে আমার আশা ছেড়ে দিয়ে সবাই অন্য ডাক্তারের কাছে যায়। আমার আর ডাক একেবারেই পড়ে না। এক পয়সাও তাই আজকাল আমি রোজগার করতে পারি না। এ অবস্থায় সিগারেটের পিছনে কী করে আমি খরচ করতে পারি?

'এমনি,' উত্তর দিলুম, 'ও-সব আর আমার ভালো লাগে না।—কিন্তু চুরির কথা তো বললেন না? কী চুরি গেছে?'

সত্যসিন্ধুবাবু উঠে দাঁড়ালেন। গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে খানিক পায়চারি করলেন তিনি। তারপর হঠাৎ আমার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি দিয়ে খানিক আমাকে যেন বিঁধতে চেষ্টা করলেন। তারপর নিজে একটি সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আমার সেই সোনার সিগারেট কেসটা হারিয়ে গেছে। কোন্‌টা জানো? ঘুঁটেখালির মহারাজার বেড়ালের বিয়ের দিন সেই অসম্ভব গোল-মালের মধ্যে পাত্রী হঠাৎ উধাও হওয়ায় আমাকে টেলিগ্রাম করে স্পেশ্যাল ট্রেনে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তোমার মনে আছে কি না জানি না—আমি পৌঁছেই পাত্রীকে আবিষ্কার করেছিলুম: রাজপ্রাসাদের পিছনের মজা-ডোবার বাঁশবনের পাশে পাত্রী তখন মাছের কাঁটা চিবোচ্ছিলেন।—মহারানী খুসি হয়ে এক ছড়া মুক্তোর

মালা দিয়েছিলেন, পরে অবশ্য জানা যায় মুক্তোগুলো ঝুটো। তারপরে মহারাজা গড়িয়ে দিয়েছিলেন সোনার সিগারেট কেস। কে জানে, পাছে সেটা সোনা না হয়ে পেতল বলে প্রমাণিত হয়, এই ভয়ে যাচাই আর করাইনি। সেই সোনার সিগারেট কেস আমার বাড়ি থেকে উধাও। ভাবো একবার!'

'খুব চিনি সেই সিগারেট কেসটা,' আমি বললুম। 'তার উপর আপনার নামের প্রথম অক্ষর তো বেগুনি রঙের মিনে করা?'

ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, 'তোমার মনে আছে দেখছি!'

'মনে থাকবে না? কতবার সেটা হাতে করে আপনার সেই আশ্চর্য শক্তির কথা আমি ভেবেছি! মনে থাকবে না? কিন্তু সেটা আর নেই, অর্থাৎ আপনি সেটা হারিয়ে ফেলেছেন—এ-কথা নিশ্চয়ই বলছেন না!'

'নিশ্চয়ই নয়। হারাবো কেন? সেটা চুরি গেছে।'

সিগারেট ফুরিয়ে গেলে সত্যসিন্ধুবাবু ইজিচেয়ারে ফিরে এসে বসলেন, পকেট থেকে বার করলেন একটা নোটবই আর পেন্সিল, তারপর গম্ভীর গলায় বলতে সুরু করলেন, 'তোমরা, মানে—ডাক্তাররা—নিজেদের অসুখ হলে অন্য ডাক্তার ডাকো। নিজেরা নিজেদের চিকিৎসা কখনো করো না। ঐখানে তোমাদের সঙ্গে আমার তফাৎ। আমি নিজেই কিন্তু নিজের বাড়ির এই চুরির তদন্ত করবো। তার আগে তোমাকে যে কতটা বিশ্বাস করি—মানে তোমার ক্ষমতায় আমি যে কতটা আস্থাবান সেটা দেখাবার জন্যে তোমার মতামত নিতে চাই। মানে তুমি হলে কী করতে তাই বলো—কী ভাবে তদন্ত করতে?'

এও কি সত্যি? কানদুটো আমার ঠিক আছে তো? স্বয়ং সত্যসিন্ধু পাকড়াশি আমার মতামত চান? আমার উপদেশ কামনা করেন? মন্ত্র-চালিতের মতো গড়গড় করে বলতে লাগলুম, 'প্রথমেই আমি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতুম, একটা পুরস্কার ঘোষণা করাও

আমার পক্ষে অসম্ভব ছিলো না। শুধু খবরের কাগজে নয়—হ্যাণ্ড-বিল ছাপিয়ে সর্বত্র ছেয়ে ফেলতুম—খেলার মাঠ, সিনেমা, রেস্তোরাঁ, বিয়েবাড়ি, শ্মশান, ইস্কুল, কলেজ, হাসপাতাল—সর্বত্র। মানে মানুষ যেখানে যায়, ফুর্তি করতে কিংবা মরতে কিংবা পুড়তে—সেই সমস্ত জায়গাতেই। তারপর একটা লিস্টি তৈরি করে খবর নিতুম সহরের সমস্ত সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিসের দোকানগুলোয়। পুলিশকেও একটা খবর দিতুম, থানার ইন্সপেক্টর সায়েবকে দু'প্যাকেট সিগারেট আর চার পয়সার পান তো গোড়াতেই খাওয়াতে হোতো। তারপর চাকর-বাকরদের সিনেমা যাবার টিকিট নিজে কিনে এনে তাদের ছবি দেখাতে পাঠিয়ে, নিজ হাতে তাদের বাক্স-প্যাঁটরা পোঁটলা-পুঁটলিগুলো হাতড়ে পরীক্ষা করে দেখতুম; তারপর সেখানে না পেলে নিজের বাড়িটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজতুম, নিজের সব জামার সব পকেটগুলোও উল্টে বাইরে বার করে দেখতে কসুর করতুম না।—অবশ্যই এ-ক্ষেত্রে নিজের বাড়ি আর নিজের পকেট বলতে আপনার বাড়ি আর আপনার পকেটের কথাই আমি বলছি।'

আমার সমস্ত কথাগুলি গম্ভীর মুখে নোটবইতে টুকে নিলেন তিনি।

আবার হেসে আমি বললুম, 'খুব সম্ভব এ-সব কিছুই আপনি করেন নি?'

রহস্যময় কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, 'সম্ভবত না।—কিন্তু বন্ধু, তুমি একটু বোসো। একটা কাজ সেরে এখনি ফিরছি।' বলেই ঘর ছেড়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

আজ আবার নতুন দৃষ্টিতে আমি এই অতি-পরিচিত ঘরটিকে যেন নতুন করে দেখতে লাগলুম। সামনের দেয়ালের খাঁজকাটা তাকে সারিসারি কাঁচের শিশি রয়েছে। প্রত্যেকটির গায়ে লেবেল আঁটা। লেবেলগুলো এই ধরনের: 'চৌরঙ্গির রাস্তার ধুলো', 'বাসের পা'দানির ছেঁড়া টিকিট', 'ট্রামের (বেহালা লাইনের) পা-দানির ছেঁড়া

টিকিট', 'মেট্রো সিনেমার সিগারেটের শেষ অংশ', 'লাইটহাউসের কারপেটের রোঁয়া', 'কাফে ডি ক্যালকাটা'র বেতের চেয়ারের ভাঙা টুকরো'—এই ধরনের নানা সব আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ জিনিসে ভরা কাচের শিশিগুলো। কিন্তু জগতে কিছুই তুচ্ছ নয়। এই ধুলোবালি, সিগারেটের টুকরো, কারপেটের রোঁয়াই সত্যসিন্ধু পাকড়াশিকে আজ উন্নতির চরম শিখরে তুলেছে।

এইসব কথা গভীরভাবে যখন ভাবছি হঠাৎ সামনের দরজাটা খুলে গেলো। চমকে দেখলুম এক প্রৌঢ় জাহাজের খালাসি ঘরে ঢুকেছে। একমুখ অপরিষ্কার তার দাড়ি। একটা চোখে ঠুলি-পরা, সবুজ হ্যাফ-প্যান্টটা অতিশয় নোংরা, দাঁতগুলো খয়েরি। উত্তেজিত হয়ে আমি দাঁড়িয়ে উঠতেই লোকটা ভাঙা গলায় বললো, 'হজৌর, গলতি হো গিয়া।' বলেই দরজা খুলে সে আবার বেরিয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি তার পিছন-পিছন নিচে নেমে এলুম। ততক্ষণে লোকটা কিন্তু বাড়ির সামনের একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গেলো। একটু চিন্তিতভাবেই ফিরে এলুম। চুরির পরেই এই ধরনের খালাসির আবির্ভাব একটু সন্দেহজনক বৈকি। সত্যসিন্ধুবাবুকে বহুদিন আমি চিনি। এমন কাজ-পাগলা লোক দুনিয়াতে আর দুটি নেই। কাজের কথা ভাবতে-ভাবতে এতোই তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন যে প্রায়ই বেরুবার সময় বাড়িতে তালা দিতে ভুলে যান, বাক্স-প্যাঁটরা খোলাই পড়ে থাকে। ড্রয়ারের মধ্যে ঘড়ি, টাকা-পয়সা রাখার অভ্যেস। সেই ড্রয়ারও প্রায়ই খোলা থাকে। তাঁর আসতে দেরি দেখে ভাবলুম নিজেই একবার খুঁজে দেখি না ঘরটা। হয়তো সিগারেট কেসটা এখানেই কোথাও পড়ে আছে। প্রথমেই তাঁর টেবিলের ড্রয়ারটা ধরে টান মারলুম। এই ড্রয়ারে বহুবার ঐ সিগারেট কেসটা দেখেছি। যা সন্দেহ করেছিলুম তাই। ড্রয়ারে চাবি দিতে তিনি ভুলে গেছেন। টানতেই খুলে গেলো। কিন্তু সবটা খুললো না। ভিতর দিকে কিসে যেন

বাধা পেয়ে আটকে গেলো। থাকগে, যতটা খুলেছি ততটাই যথেষ্ট। ভিতরে বাস্তবিক নানা সব জিনিসপত্রের ভিড় : মানি-ব্যাগ, হাত-ঘড়ি, ফাউন্টেনপেন, র‍্যাশন কার্ড, রেডিও লাইসেন্স, চেক-বই ইত্যাদি। কিন্তু সিগারেট কেসটা নেই। ড্রয়ারটা বন্ধ করে দিলুম। তার হাতলটা কিন্তু ভারি নোংরা। হাতটা চ্যাটচ্যাট করছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে চ্যাটচেটে আঙুলগুলো মুছে ফেললুম। তারপর আর কোনো করার মতো কাজ নেই দেখে সেই ইজিচেয়ারটায় ফিরে এসে অপেক্ষা করতে-করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনেই নেই।

হয়তো আমি স্বপ্নই দেখছিলুম। কিন্তু ইজিচেয়ারের মধ্যে অস্পষ্ট যেন আমার মনে হয়েছিলো কে যেন খুব সাবধানে আমার জামার পকেটগুলো হাতড়াচ্ছে! কতক্ষণ ঘুমিয়েছি মনে নেই। জেগে উঠে দেখি সামনের চেয়ারে পাইপ ধরিয়ে সত্যসিন্ধুবাবু বসে রয়েছেন। আমাকে চোখ মেলতে দেখে বললেন, 'তুমি ঘুমুচ্ছিলে তাই আর জাগাইনি।'

'কিন্তু কী খবর? এই রহস্যের কোনো কিনারা হোলো?'

'হোলো বৈকি! আশাতীত রকম ভালো ফল পেয়েছি। আর পেয়েছি তোমারি জন্যে। বলে তিনি নোটবইতে টোকা দিতে লাগলেন। আমি আরো বিশদ বিবরণের জন্যে অপেক্ষা করে রইলুম। কিন্তু আর কোনো কথা তিনি বললেন না। বরঞ্চ পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো সিন্দুকের সবচেয়ে কড়া তালা খুলে ফেলা সহজ, কিন্তু সত্যসিন্ধু পাকড়াশি একবার কথা বলতে না চাইলে তাঁর মুখ খোলানো সম্ভব নয়।

উঠে পড়লুম। পিঠ চাপড়ে তিনি বললেন, 'আবার এসো কিন্তু। কিন্তু তাঁর সেই চাপড়ানিটা একবার পিঠে পড়েই আমার বুক-পকেট এবং পাশের পকেটের উপরেই বারকতক যেন পড়লো। অবশ্য এটা আমার ভুল হতে পারে।

এর পর সংসার চালাবার জন্যে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জিনিস যারা

কেনাবেচা করে সেই রকম কয়েকটি দোকানে আমাকে কয়েকবার যাতায়াত করতে হয়। সেই রকম কয়েকটি দোকানেই একজন অদ্ভুত আলখাল্লাপরা মানুষ একাধিকবার আমার নজরে পড়ে। সেই বেশ-ভূষা, চোখের চাউনি আর চলার ধরনের সঙ্গে সত্যসিন্ধুবাবুর কিন্তু অনেকখানি মিল আছে। ইতিমধ্যে যতবারই তাঁর বাড়িতে গিয়েছি কোনোবারেই তাঁর সাক্ষাৎ পাইনি।

তাই, দিনচারেক পরে তিনি যখন চাকর মারফৎ আমাকে ডেকে পাঠালেন তখন এই আশ্চর্য শক্তিমান পুরুষের সাক্ষাৎ পাবার আশায় উল্লসিত না হয়ে পারেনি।

তাঁর ঘরে ঢোকবার পর আমাকে আশ্চর্য করে তিনি দরজাটা ভিতর থেকে তালা দিয়ে ভালো করে বন্ধ করলেন, একটিও কথা না বলে বারকয়েক পায়চারি করলেন ঘরের মধ্যে। তারপর অকস্মাৎ পকেট থেকে একটা পিস্তল ঝট করে বের করে একেবারে আমার বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে চাপা-কঠিন স্বরে বললেন, 'আমার সিগারেট-কেসটা ফিরিয়ে দাও! শিগগির দাও !!'

আমার গলার কাছটা আঠা-আঠা হয়ে এলো। কোনো রকমে বলতে পারলুম, 'আমার কাছে সেটা নেই।'

তিক্ত হাসি হেসে তিনি বলে চললেন, 'এই উত্তরই আমি আশা করেছিলুম। কিন্তু একে-একে মন দিয়ে আমার কথা শুনে যাও—'

'কিন্তু নিশ্চয়ই আপনি তামাসা করছেন? নিশ্চয়ই আপনি আমাকে অবি—'

'চুপ। একটি বাজে কথা নয়।' বলে সেই নোটবই বার করে তিনি বলতে লাগলেন, 'নিজেই নিজেকে তুমি ধরিয়ে দিয়েছো।— তুমি প্রথম যে-দিন সিগারেট-কেসটা দেখেছিলে সেদিনের ঘটনা থেকেই সুরু করা যাক। সেটা দেখেই তুমি বলেছিলে, তোমার মনে নিশ্চয়ই আছে—বাঃ, কী চমৎকার! আমাকে কেউ ও-ধরনের একটা

'কেস' দেয় না।—পাপের পথে সেই তোমার প্রথম পদক্ষেপ। 'আমাকে কেউ দেয় না' ঐ কথাটাই তোমার মনে ঘুরতে-ঘুরতে ক্রমশ রূপান্তরিত হোলো এইভাবে : 'আমাকে ওটা বাগাতেই হবে।' তারপর তোমার মনে প্রশ্ন এলো, কী করে ওটা বাগানো যায়?'—চুপ, একটি বাজে কথা নয়—তার ওপর মনে রেখো নিজেও তুমি একটি সিগারেট-খোর।—'

'কিন্তু ওই বদ্-অভ্যেস আমি তো ছেড়ে দিয়েছি!'

'গর্দভ! ঐ কথা বলেই তো নিজেকে তুমি আবার নিজেই ধরিয়ে দিয়েছো। যাতে সহজেই আমার মনে হয় তুমি যখন সিগারেট ছেড়েছো তখন নিশ্চয়ই সিগারেট-কেসের ওপর তোমার কোনো লোভ নেই, সেইজন্যই ও-কথা তুমি বলেছিলে!—চুপ, একটি বাজে কথা নয়—কয়েকদিন আগেই ঐ চুরি তুমি করো। সেই রাত্রেই করো যখন তোমার সামনের ড্রয়ারের মধ্যে সিগারেট-কেসটা আমি রাখি। তুমি ড্রয়ারের পাশের ঐ চেয়ারটায় বসে ছিলে। আমি একবার উঠেছিলুম শেলফ থেকে একটা জিনিস আনতে। যেই পিঠ ফিরিয়েছি অমনি তুমি ড্রয়ার থেকে বাগিয়ে নিয়েছো। তোমার হাতের মাপ কয়েকদিন আগেই তোমার পিঠ চাপড়াবার সময় সংগ্রহ করেছি। কতটা জানো—ঐ চেয়ার থেকে ড্রয়ারের দূরত্ব যতটা ঠিক ততটা। তারপর সেদিন আবার তুমি ড্রয়ারটা খুলেছিলে। পাশের ঘরের ফুটো দিয়ে আমি সব লক্ষ্য করেছি। তা ছাড়া ড্রয়ারের হাতলে আমি আগে থেকেই একটু আঠা লাগিয়ে রেখেছিলুম। সেই আঠায় তোমার আঙুলের ছাপও স্পষ্ট পড়েছে। তারপর সেই খালাসিকে মনে আছে? হঠাৎ যে এ-ঘরে ঢুকেছিলো। সে আর কেউ নয়—স্বয়ং আমি।—কিন্তু ওকি! চুপ করে বসে থাকো। নইলে—নইলে—'

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগেই আমি বিদ্যুৎবেগে উঠে এক টানে ড্রয়ারটা খুলে ফেললুম। আগেকার মতোই সবটা খুললো না,

কিসে যেন আটকে যাচ্ছে। সাবধানে হাত ঢুকিয়ে সেই বাধা-দেওয়া জিনিসটাকে টেনে বার করলুম। সেটা আর কিছুই নয়: সেই সিগারেট-কেসটা।

'একি—একি!' বলতে-বলতে সত্যসিন্ধুবাবুর হাত থেকে পিস্তলটা মেঝেয় পড়ে গেলো।

'তা হলে, তা হলে জীবনে এই কি প্রথম আমার অনুমান ভুল হোলো! জিনিসটা ড্রয়ারেই ছিলো আর আমি চোর খুঁজে বেড়াচ্ছি?'

'সম্ভবত তাই। কিন্তু জীবনে এই আমার শেষ ভুল। আর কখনো হবে না।' বলে গটগট করে বেরিয়ে সোজা আমার ডাক্তারখানায় ফিরে এলুম।

ক্রমশ এখন ডাক্তার হিসেবে আমার পসার বাড়ছে, কয়েকজন রোগী সত্যিই আমার হাতে বেঁচে উঠেছে—সত্যসিন্ধু পাকড়াশির বাড়ি কিংবা পুরোনো জিনিসের দোকানে আর আমি যাই না।

॥ ছাতুবাবুর ছাতা ॥

বাসে কিংবা ট্রামে, পথে কিংবা মাঠে, কোনো-না-কোনো সময়ে নিশ্চয়ই তোমরা ছাতুবাবুকে দেখেছো। মাঝ-বয়সি ভদ্রলোক, মাথার চুল কাঁচাপাকা মেশানো, সামান্য টাক, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা গলা-বন্ধ এক কোট, পায়ে ফিতে-খোলা খয়েরি রঙের ক্যাম্বিসের জুতো। ভুরুগুলো ঘন কালো, মাঝে-মাঝে এক মুখ গোঁফ-দাড়ি, মাঝে-মাঝে একেবারে পরিষ্কার। সব সময়েই খুব চিন্তিত একটা ভাব। অনেক সময় নিশ্চয়ই তোমরা ভেবেছো : কে এই ভদ্রলোক? আর কেউ নন, তিনিই ছাতুবাবু।

পাড়ায় তাঁর অত্যন্ত বদনাম। লোকে বলে সকালে তাঁর নাম উচ্চারণ করলে সেদিন নাকি ভাত জোটে না, ছেলেরা বলে পরীক্ষা দিতে যাবার আগে তাঁকে দেখেছিলো বলেই ফেল করেছে, অসুস্থ লোকের খবর ছাতুবাবু নিতে গেলে আত্মীয়রা রোগীর আশা ছেড়ে দেয়। কিন্তু এ সমস্ত কোনো কাজের কথা নয়। মিছিমিছি বদনাম দেওয়া লোকের একটা বদ-অভ্যেস। আমি জানি আসলে ছাতুবাবু বদও নন, কৃপণও নন—তিনি অত্যন্ত হিসেবী। হিসেব করা তাঁর একটি বাতিক।

তোমাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ নেই। যাঁর এতো দুর্নাম সে-রকম লোকের সঙ্গে আলাপ করতে নিশ্চয়ই তোমরা খুব ভয় পাও। কিন্তু আলাপ থাকলে দেখতে, লোকটাকে যতোটা খারাপ ভাবো তার সিকিভাগও খারাপ তিনি নন। নানা লোকের নানা শখ থাকে। কেউ ফুটবল ম্যাচ দেখতে ভালোবাসে, কারুর বাতিক সিনেমা দেখা,

ডাকটিকিট জমানো, কিংবা ফোটো তোলা। ছাতুবাবুরও তেমনি একটা শখ আছে : হিসেব করা।

তাঁর সঙ্গে আলাপ হলেই ছাতুবাবু খুব সহজে বুঝিয়ে দেবেন, এই বোমার হিড়িকে কলকাতায় যতো ব্যাফল-ওয়াল উঠেছে তার ইট দিয়ে প্রায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো একটা বড় বাড়ি করা যেতে পারতো, কিংবা প্রত্যহ পৃথিবীতে মানুষের মাথায় চুল যত নষ্ট হয় সেগুলো একবছর জমালে পৃথিবীর প্রত্যেক লোককে তাই দিয়ে অন্তত দশটা করে কম্বল তৈরি করে দেওয়া যেতো, ইত্যাদি।

এই যুদ্ধের বাজারে লোকের খরচ ডবল, তিন-ডবল, কি আরো বেশি গেছে বেড়ে। ছাতুবাবু তার সহজ সমাধান করেছেন। প্রথমত ধরো ব্লেড। চার পয়সার জিনিস আট আনা হয়েছে। ছাতুবাবু আমাকে বললেন, 'অতো ভাবছো কেন ? আটগুণ দাম বেড়েছে তো আটগুণ কম ব্যবহার করলেই পারো। আগে যদি রোজ কামাতে, এখন আটদিন ছাড়া কামিও, আগে দু'দিনে একবার কামালে এখন কামিও ষোলো দিনে একবার। তা'হলেই দেখবে খরচ বাড়ে নি।'

চালের দর পাঁচগুণ বাড়ায় ছাতুবাবু হিসেব করে বাড়ির লোকদের বুঝিয়ে দিলেন, বেঁচে থাকার পক্ষে যতটা খাদ্য দরকার, আমরা অন্তত তার পাঁচভাগ বেশি খেয়ে শরীর নষ্ট করি। অতএব আগে তাঁর বাড়িতে যে-জায়গায় পাঁচ মণ চাল আসতো, আজ সে-জায়গায় আসে এক মণ। খরচ আগেও যা ছিলো, এখনো তা-ই আছে। ছাতু-বাবুর হিসেবের সত্যতা হাতে-হাতে পাওয়া গেলো। কিন্তু চালের পরিমাণ পাঁচ ভাগ কমানোয় স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়ার পরিমাণ দশভাগ গেলো বেড়ে। ছাতুবাবু ঠিক করলেন, এ-সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে আগে তিনি দিনে যত ঘণ্টা বাড়ির বাইরে থাকতেন এখন তার দশগুণ বেশি বাইরে কাটাতে পারলে। কিন্তু এইখানেই ছাতুবাবু প্রথম পড়লেন অসুবিধেয়, হার হল তাঁর হিসেবের। কারণ আগে তিনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ ঘণ্টা থাকতেন বাইরে, এখন

হিসেব মতো তাঁকে থাকতে হবে একশো ঘণ্টা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একশো ঘণ্টা কী করে বাইরে থাকা যায়—ভাবতে-ভাবতে তাঁর চুল-গুলো পট-পট করে পাকতে আরম্ভ করলো। অথচ হিসেব তাঁর ভুল হতে পারে না। হিসেব তাঁর নিখুঁত।

একশো ঘণ্টা না হোক, ছাতুবাবু ঠিক করলেন, যতটা সময় পারা যায় বাড়ির বাইরে কাটাবেন। সকাল ন'টায় তিনি আপিসে বেরিয়ে যান। পাঁচটায় ছুটির পর ট্রামে-ট্রামে ঘোরেন। বাড়ি ফেরেন রাত দশটায়। ট্রামে বেড়ানোর খরচ তাঁর বাড়েনি। আজ পনেরো বছর ধরে তাঁর মাসিক-টিকিট আছে।

দেখতে-দেখতে বর্ষা এসে গেলো। অনেকদিন ধরেই ছাতুবাবু ছত্রহীন জীবন যাপন করছিলেন। এবারকার বর্ষার দৌরাত্ম্যে তাঁকে একটা ছাতা কিনতেই হোলো। দাম শুনে প্রথমটা তিনি চমকে উঠেছিলেন : ত্নু-টাকার জিনিসটা বিনা বাক্যব্যয়ে একেবারে চোদ্দো টাকায় উঠেছে! সাতগুণ দাম বেশি। তিনি হিসেব করে দেখলেন গত পঁচিশ বছরের মধ্যে গড়-পড়তা তিন বছর ছাড়া একটা করে নতুন ছাতা তাঁকে কিনতে হয়েছে। চোদ্দো টাকা দিয়ে ছাতাটা কিনে মনে-মনে তাঁকে হিসেব করে দেখতে হোলো, একুশ বছরের মধ্যে তিনি আর ছাতা কিনতে পারবেন না।

কিন্তু ভগবান স্বয়ং তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করলেন। ছাতা কেনার তিনদিন পরে একদিন ট্রাম থেকে নেমে বৃষ্টিতে আধঘণ্টা ভেজবার পর হঠাৎ তাঁর খেয়াল হোলো মাথার উপর ছাতাটা নেই। মনে পড়লো ট্রামে সেটা তাঁর পাশে ছিলো, নামবার সময় সেখানেই রয়ে গেছে। নামাতে গেছেন ভুলে। প্রথমটায় তিনি কিন্তু আশা ছাড়েন নি। যে ট্রামে ওঠেন, সে ট্রামের নম্বর মুখস্থ করা তাঁর একটা বাতিক। নম্বরটা মনেই ছিলো। সোজা চললেন ট্রামের ডিপোয়। কিন্তু কোনো ফল হোলো না। সেই ট্রামের কণ্ডাক্টরের ছুটি হয়ে গিয়ে-ছিলো। সে বাড়ি যাচ্ছিলো। ছাতুবাবুর কথা শুনে বললো, 'এখন

আমার মনে পড়ছে মশাই। লুঙ্গি আর ফতুয়া পরা একটা লোক একেবারে নোতুন একটা ছাতা নিয়ে ট্রাম থেকে নেমেছিলো বটে। লোকটার চেহারার সঙ্গে নোতুন ছাতাটা একেবারেই মানাচ্ছিলো না। তাই আমার মনে আছে।'

ছাতুবাবু অত্যন্ত দমে গেলেন। এই বাজারে একেবারে আনকোরা নোতুন একটা ছাতা হারানো খুব কম কথা নয়। তা'ছাড়া হিসেবের এই এ-ধরনের দুর্ঘটনার কথা তিনি ভেবে দেখেন নি। আবার চোদ্দো টাকা খরচ করে একটা ছাতা কিনলে তিনি আরো একুশ বছর অর্থাৎ মোট বেয়াল্লিশ বছর ছাতা কিনতে পারবেন না। কিন্তু আরো বেয়াল্লিশ বছর তিনি হয়তো না-ও বাঁচতে পারেন। এবং না-বাঁচলে তো সমূহ লোকসান। এবার গোড়া থেকেই তিনি অতিরিক্ত সাবধান হয়ে গেলেন যাতে হিসেবে কোনো ভুল আর না হয়। ঠিক করলেন ছাতা আর কিনবেনই না। বৃষ্টিতে ভিজে জ্বরে পড়লে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাবেন। খরচ অনেক কম।

তা-ছাড়া এই ছাতা-হারানো ব্যাপারটা তাঁর জীবনে এই প্রথম নয়। বরাবর তাঁর ছাতাগুলি হারিয়েই গেছে, ছিঁড়ে কিংবা ভেঙে যায়নি। কোনোটা হারাতে লেগেছে চার বছর, কোনোটা বা দু'বছর। গড়পড়তায় তিন বছর অন্তর একটি করে ছাতা তিনি হারিয়েছেন। ইতিপূর্বে অনেকবার অনেক আশ্চর্যভাবে ছাতা তিনি ফিরে পেয়েছিলেন। এই ট্রাম-ডিপো থেকেই তো তিনি বার-চারেক ছাতা ফিরে পেয়েছেন। তাই মনে-মনে তিনি একেবারে নিরাশ হলেন না। হয়তো একদিন দৈব উপায়ে ছাতাটা তাঁর কাছে ফিরে আসবে—কেবলই এ কথা তাঁর মনে হতে লাগলো। কিন্তু দৈব ঘটনার উপর তো কোনো হিসেব চলে না। তাই কবে যে ছাতাটা ফিরে আসবে সঠিকভাবে তিনি অঙ্ক কষে বার করতে পারলেন না।

এদিকে ক্রমশ বর্ষা বাড়তে লাগলো, আর ছাতুবাবুও ক্রমাগত লাগলেন ভিজতে। ভিজে-ভিজে বার চারেক ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়লেন।

তিন-চার শিশি ওষুধও শেষ হোলো। অথচ ছাতার কোনো কিনারা হোলো না। কারুর হাতে নতুন ছাতা দেখলেই তাঁর চোখদুটো চকচক করে ওঠে। কিন্তু সবাইকার হাত থেকে তো ছাতা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় না! অতি কষ্টে চুপচাপ বসে থাকেন। নোতুন ছাতার মিছিল যেন তাঁর চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মানুষগুলোর বেহিসেবি কাণ্ড দেখে মনে-মনে তিনি লজ্জা পান।

সেদিন অন্ধকার রাত। প্রায় তখন সাড়ে ন'টা হবে। এলগিন রোডের মোড়ে ট্রাম থামবার জায়গায় ছাউনির তলায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। হিসেব মতো বাড়ি ফেরবার সময় হয়েছে। এবারে তিনি ফিরতি-ট্রাম ধরবেন। সেখানে আরো দু'জন লোক দাঁড়িয়ে ছিলো। অন্ধকারে তাদের চেহারা ভালো বোঝা যায় না। এটুকু শুধু বোঝা যায় তাদের একজন বেজায় মোটা, আর-একজন আবার তেমনি রোগা।

কথা শুনেই ছাতুবাবু বুঝলেন লোকদু'টো গাঁজা খেয়েছে। বেজায় টেনেছে। ও-পাশের পথ থেকে তারা একটা ফিটন ভাড়া করতে চায়। গাড়িটা দূরে রয়েছে, এখান থেকে ডাকলে গাড়োয়ান শুনতে পাবে না। যেতে হবে ওখানেই। এখন সমস্যা হয়েছে তাদের কাছে ছাতা রয়েছে একটা, আর সেই একটা ছাতার তলায় দু'জনে তারা কুলোয় না। এদিকে বৃষ্টিটাও নেমেছে জোরে। ছাতুবাবুকে বুড়োসুড়ো লোক দেখে তারা তাঁর কাছে এসে প্রায় পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেই ফেললো।

'আহা করেন কী, করেন কী—' বলে দু'পা সরে এলেন ছাতুবাবু।

তাদের মধ্যে যে লোকটা মোটা সে বললো, 'আপনি প্রবীন লোক, আমাদের বিপদের কথা তো শুনলেন। এই এক ছাতার

তলায় তু'জনে গাড়ি ধরতে গেলে তু'জনেই ভিজবো। এখন আপনি একটা উপায় করে না দিলে আমাদের সারা রাত এখানেই থাকতে হবে!'

ছাতুবাবু বললেন, 'তা, আপনারা অত ভয় পাচ্ছেন কেন? এক কাজ করুন না। আপনারা একজন এখানে থাকুন, আর-একজন ছাতাটা মাথায় দিয়ে গাড়ি ডেকে আনুন।'

'তাই তো, সত্যিই তো!' তাদের তু'জনেই প্রায় সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো। তারপর মোটা লোকটা বললো, 'কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো, মশাই, বুঝতে পারছি না। আপনি না-থাকলে সমস্ত রাতই আমাদের তু'জনকে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হোতো। আর সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে থাকলে আমরা তু'জনেই মরে যেতুম। আপনি আমাদের প্রাণ বাঁচালেন! কী বলে যে ধন্যবাদ জানাবো, বুঝতে পারছি না। আপনার তো হাতে ছাতা নেই, এই ছাতাটা অনুগ্রহ করে হাতে নিন।'

ব্যস্ত হয়ে ছাতুবাবু আপত্তি জানালেন।

রোগা লোকটা ততক্ষণে প্রায় কেঁদেই ফেলেছে। বললো, 'কিছুতেই আপনার আপত্তি শুনবো না, মশাই। ছাতাটা নিতেই হবে। আহা, ছাতাটা আমার বড়ো আদরের। ট্রামে এক বুড়ো ফেলে গিয়েছিলো। সে-ট্রামেই আমি ছিলুম। অন্য লোকের পকেট থেকে বেশ তু'পয়সা কামিয়ে নামবার সময় ছাতাটা একলা পড়ে রয়েছে দেখে নিয়ে নামলুম। ভারি পয়মন্ত ছাতা, মশাই। আপনাকে নিতেই হবে।'

'কিন্তু আপনারা যাবেন কী করে?'

'আমাদের জন্যে ভাববেন না। আপনি আমাদের জীবন দিলেন, আর আপনার জন্যে আমরা সামান্য ভিজতে পারবো না?' রোগা লোকটা বললো।

মোটা লোকটা তার হাত ধরে তাড়া দিলো, 'আর দাঁড়াস নে,

নিধে। আয়, চল্, ভদ্দরলোক আবার ছাতাটা হয়তো ফেরৎ দিতে চাইবে। দিয়ে নিলে কী হয় জানিস তো ?'

'চললুম দাদা। চিরকাল আপনার দয়ার কথা'······রোগা লোকটা কথা শেষ করতে পারলো না। মোটা লোকটা তার হাত ধরে টেনে নিয়ে সেই দারুণ বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে টলতে-টলতে মিলিয়ে গেলো।

ট্রামের আলোয় ছাতুবাবু দেখলেন ছাতাটা তাঁরই বটে। এককোণে ছুরি দিয়ে 'C' লিখেছিলেন। অক্ষরটা এখনো স্পষ্ট রয়েছে।

কোন্ হিসেবে তিনি যে ছাতাটা ফেরৎ পেলেন, ছাতুবাবু ভালো করে বুঝতে পারলেন না। এই প্রথম হিসেবটা তাঁর কাছে বেশ জটিল ঠেকলো।

॥ মর্মর ॥

এইবার দিল্লি থেকে ফেরার পথে ট্রেনে উঠে মনে মনে বললুম : আর না, এই শেষ! একবার নয়, দু'বার নয়, বার-বার তিনবার! চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে আর যেখানে যাই—করাচি কি লামডিং, কানপুর কি কোহিমা—দিল্লি আর নয়! আগের দু'বার ইণ্টারভিউ দিতে আসতে হয়েছিলো দারুণ গ্রীষ্মে। লাভের মধ্যে শুধু হয়েছিলো শরীর আধখানা আর পকেট খালি। কিন্তু চাকরি হয়নি। এবারও তাই। তবে একমাত্র ভালো যা দেখছি এবার আসতে হয়েছে শীতে। তাই অন্যান্য বারের মতো এবার শুধু দিল্লি ইস্টিশানে ওঠা আর হাওড়ায় নামা হয়। ঠিক করেছি অন্তত আগ্রা হয়ে তাজমহল দেখে ফিরবো।

কিন্তু কে তখন জানত এবার আমার কপালে তাজমহল দেখা নেই!

যখন ট্রেনে উঠলুম কামরা বেশ খালি ছিলো। কিন্তু আজকাল তো খালি থাকার উপায় নেই। দেখতে-দেখতে ভরে উঠলো : বেঁটে-লম্বা, রোগা-মোটা, ইহুদি-বার্মিজ, মুসলমান-হিন্দু, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, ছেলে-মেয়ে—একেবারে মানুষের খিচুড়ি।

এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছি, এমন সময় একটি পাঞ্জাবী মুসলমান ছেলে এই কামরাতেই উঠলেন। পরনে গরম ট্রাউজার আর কালো শেরোয়ানি, মাথায় লাল ফেজ। টকটকে রঙ, উন্নত কপাল, টিকলো নাক, আর দু-জোড়া গভীর কালো বাঁকানো ভুরুর নিচে গাঢ় নীল চোখ। তার সমস্ত চেহারার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি, প্রতিভার স্বাক্ষর। অথচ সমস্ত ভঙ্গিতে একটি বিষণ্ণ মধুরতা।

ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলুম তার কারণ সেই আশ্চর্য দুটি চোখ। সে চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল অথচ তীক্ষ্ণ নয়। বিষণ্ণ অথচ মধুর। সে যেন এই কামরার অদ্ভুত জনতার মধ্যে দাঁড়িয়েও নিজের চারিদিকে একটি নির্জনতার পাঁচিল তুলে দিয়েছে। আমার পাশে দাঁড়িয়েও সে যেন রয়েছে অনেক—অনেক দূরে। ভিড় দেখে সমস্ত মেজাজ যে-রকম বিগড়ে গিয়েছিলো তাকে দেখেই কিন্তু আবার হাল্কা হয়ে এলো। নিজেকে আরো অনেকটা সঙ্কুচিত করে আমার পাশ থেকে দুটো বই সরিয়ে কোনো রকমে আর-একটি মানুষের মতো জায়গা করে হেসে তাকে ইংরিজিতে বললুম বসতে। সে-ও হাসলো, তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে, দুটো বেঞ্চির মাঝখানে-রাখা আমার হোল্ড-অলের উপর বসে ইংরিজিতে বললো, 'এইখানে বসলে আমরা দুজনেই আরামে যেতে পারবো। কিন্তু আপনি কি বাঙালি?'

বললুম, 'হ্যাঁ, কিন্তু কী করে জানলেন?'

ছেলেটি পরিষ্কার বাংলায় বললো, 'বাঙালিকে বাঙালি বলে চিনে ফেলা খুব এমন কঠিন নয়। বিশেষ করে আমার পক্ষে, যে ছ'বছর কলকাতায় ছিলো।'

দেখতে দেখতে আলাপ হয়ে গেলো। ছেলেটির নাম মির্জা। কলকাতার আর্ট-স্কুলের ছাত্র ছিলো। সেখান থেকে পাশ করে গিয়েছিলো ফরাসি দেশে মূর্তি-গড়া শিখতে। আমাদের গল্প জমে উঠলো। পাঁচমিশেলি লোকের ভিড়ে আমরা যে ট্রেনের কামরায় বসে আছি, সে-কথা আমি তো স্রেফ ভুলেই গেলুম। তার মধ্যে যেন কী-একটা আকর্ষণী শক্তি আছে! কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অপরিচিতকে আত্মীয় করে নেবার দুর্লভ মন্ত্র।

'আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে এর আগেও দিল্লি এসেছিলেন।'

'হ্যাঁ, এইবার নিয়ে তিনবার। আশা করি এইবারই শেষবার।'

মিষ্টি হেসে সে বললে, 'ইন্টারভিউ দিতে বুঝি?'

বিস্মিত হয়ে বললুম, 'কী করে জানলেন?'

আবার হেসে সে উত্তর দিলো, 'এ আর এমন শক্ত কথা কী? দিল্লিতে আজকাল কি কেউ শখ করে বেড়াতে আসে? হয় ব্যবসা, নয় চাকরি। আর যেহেতু আপনি বাঙালি, সে-হেতু অনুমান করা শক্ত নয় এসেছিলেন চাকরিরই খোঁজে। আপনার কথা শুনে বুঝলুম চাকরিটা হোলো না। কেমন, নয়?'

খুব সহজ করেই কথাগুলো সে বললো। আমারো মনে হোলো বাস্তবিকই কত সহজ আমার কথা জানা। তবুও কেমন যেন অস্বস্তি লাগলো। মির্জার সেই গভীর নীল চোখের দৃষ্টি যেন আমার মনকেও স্পর্শ করেছে। আমার ভাবান্তরের দিকে লক্ষ্য না করে সে বলে চললো, 'কিন্তু বন্ধু, কখনো হতাশ হয়ো না—তুমি বলে কথা বললে অসন্তুষ্ট হবে তা তো? তুমি বলতেই ভালো লাগে। আপ্ কিংবা আপনিটা বড্ড দূরে রাখে মানুষকে। হ্যাঁ, যা বলছিলুম।—আমার তো মনে হয় মানুষের ভাগ্য হচ্ছে পাগলা ঘোড়ার মতো। কেবলি লাফায়, পিঠে চড়ে বসতে দেয় না। তাই বলে তুমি যদি হাল ছেড়ে বসে থাকো তাহলে তো হার হোলো। কখনো হতাশ হোয়ো না। সেই পাগলা ঘোড়ার পিঠে জোর করে চেপে বসো; প্রমাণ করো তুমি তার প্রভু, সে তোমার নয়। হয়তো প্রথমে দুচারবার সে লাফাবে, পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করবে। কিন্তু যদি তুমি ঠিকমতো লাগাম কষে বসতে পারো, ছাপ্‌টি লাগাতে পারো তার বেয়াদপি পিঠে—দেখবে, সে তোমার বশ হয়ে এসেছে। দেখবে, সেই ঘোড়াই নিয়ে যাচ্ছে তোমাকে দেশ থেকে দেশান্তরে। একটির পর একটি রাজ্য জয় করে তোমাকে দিগ্বিজয়ী করে তুলতে। চাকরি হোলো না তো কী হয়েছে? অন্য পথ দেখো। ব্যবসা করো। প্রত্যেক মানুষের উপযুক্ত পথ তো সংসারে আছেই। শুধু খুঁজে নিতে হয়।' এক নিশ্বেসে এতগুলো কথা বলে সে একটু লজ্জিত হোলো। তারপর হেসে বললো, 'উপদেশ দিলুম বলে রাগ করলে না তো?

তোমাকে ভালো লাগলো বলেই বললুম। এ আমার মনের কথা। তাছাড়া—' এবারে একটু দুষ্টু হেসে বললো, 'তাছাড়া তোমার কপালেও লেখা রয়েছে ব্যবসাতেই তোমার উন্নতি।'

আমি বললুম, 'সত্যি নাকি ? আর কী লেখা রয়েছে বলতে পারো ?'

'বলবো ?' আবার সে হাসলো, 'তুমি টুণ্ডলায় নামবে, আর যাবে আগ্রায় তাজমহল দেখতে। কিন্তু এ-যাত্রায় দেখা হবে না।'

সত্যি-সত্যি এবার বিস্মিত হয়ে বললুম, 'কী করে জানলে ?'

'কোনটা ?

'দুটোই।'

খুব একটা গম্ভীর-গম্ভীর গণক-গণক মুখ করে বললো, 'তুমি যে-রাতে জন্মেছিলে, সে-রাতে চাঁদ উঠেছিলো বারোটায়। আজও তাই উঠবে। শাস্ত্রমতে সে-কারণেই তোমার কপালে আজ রাতে তাজমহল দেখা নেই। যে-রকম হাওয়া বইছে, আর আকাশটা মেঘে ছেয়ে রয়েছে, তাতে বৃষ্টি হবে বলে বোধ হয়। এই ডিসেম্বরের শীতে বৃষ্টি মাথায় করে তুমি কি রাত বারোটায় চাঁদের আলোয় তাজমহল দেখতে যাবে বলে আশা করো ?'

হো-হো করে হেসে উঠে বললুম, 'গণকঠাকুর! তোমার গণনা কিন্তু এবার ভুল হোলো। আমি যখন জন্মেছিলুম তখন খটখটে রোদ। রাত নয়।—কিন্তু সে-কথা যাক। আমি যে আগ্রায় যাচ্ছি সে-কথা কে বললে ?'

'কে আবার ? কেউ না! সোজা কলকাতায় যাবার মতলব থাকলে তুমি তো বিছানাটা খুলে অন্তত পিঠে একটা বালিশ লাগিয়ে বসতে!'

'কিন্তু আগ্রাতেই যে যাবো, সে-কথাই বা বললে কে ?'

'অন্য কোথাও গেলে অন্য ট্রেনে উঠতে, দিনের গাড়িতে। তাছাড়া বাঙালি-বাবুরা তাজমহল দেখতে বড়ো ভালোবাসে। কিন্তু তুমি এর আগে যে আগ্রায় আসোনি, সে-কথাও আমি বলতে পারি।'

যদিও নিতান্তই রহস্যচ্ছলে কথাবার্তা চলছিলো তবুও এমন একটা

অস্বস্তি বোধ করছিলুম, যা ঠিক বর্ণনা করতে পারবো না। তাই শুধু প্রশ্ন করলুম, 'বলো, কী করে জানলে ?'

আবার সে হো হো করে হেসে বললো, 'যারা আগে একবারো আগ্রা গেছে তারা জানে সকালের ট্রেনে যাওয়াই সব দিক দিয়ে সুবিধের। কোনো বদল নেই।' তারপর একটু হেসে বললো, 'আমার বাড়িও আগ্রায়। সকালের ট্রেন মিস করেছি বলেই এই গাড়িতে উঠতে হোলো। দেখছি লোকসান হয়নি। তোমার মতো একটি বন্ধু আজ পেলুম, এবং সে-বন্ধুটিকে আমার গরিবখানায় নিয়ে ধন্য হবো।— আমাদের বাড়িতেই তোমাকে ভাই থাকতে হবে কিন্তু। কোনো আপত্তি শুনবো না।'

'এ তো বড় মজার ব্যাপার হোলো!' ঠিক কী বলবো ভেবে না পেয়ে বললুম।

মির্জা আবার হাসতে লাগলো। বললো, 'পৃথিবীটাই মজার। কত মজার ঘটনা ঘটে দেখবে।—ভালো কথা, তোমাকে এমন একটি জিনিস দেখাবো আগ্রার তাজমহলের চেয়ে যা কম আশ্চর্য নয়।'

'কী ভাই ?'

'এখন বলবো না। তবে এটুকু বলতে পারি, তাজমহলকে হয়তো কোনোদিন ভুলে যাবে, কিন্তু সে-ঘটনা কোনোদিন ভুলবে না!'

মির্জা চুপ করলো। ট্রেনের দারুণ শব্দ হচ্ছিলো। কথাবার্তা ভীষণ চেঁচিয়ে বলতে হচ্ছিলো বলে ক্লান্ত হয়ে আমিও চুপ করলুম।

টুণ্ডলায় গাড়ি-বদল করে যখন অন্য ট্রেনে উঠলুম, তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধের দিকে চলেছে। সমস্ত আকাশ ধূসর কম্বলে ঢাকা। মাঝে-মাঝে টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছে। ইস্টিশানের ও-পাশের বড়-বড় নিমগাছগুলো ঝোড়ো হাওয়ায় ঝাঁকড়া-চুল পাগলার মতো মাথা নাড়ছে। হাতের তালু আসছে ঠাণ্ডা হয়ে, সমস্ত শরীর সিরসির করছে। সেই সিরসিরিনি যে শুধু ঠাণ্ডার জন্য নয়, তখন সে-কথা বুঝতে পারিনি।

ট্রেন-বদল করে কপাল জোরে বসতে পেলেও দেখলুম, এ-গাড়িতে রীতিমতো ভিড়। মির্জা আমার পাশে বসে বললো, 'যাক, তবু বসতে পাওয়া গেলো। গাড়ি লেট যাচ্ছে। আগ্রায় পৌঁছতে-পৌঁছতে রাত নটা। হয়তো তখন বৃষ্টি জোরেই পড়বে। আমার টেলিগ্রামটা সময়মতো পেলে হয়। বাড়ির গাড়ি না এলে বিপদে পড়বো। অনেকটা পথ।'

'বাড়িতে কে-কে আছেন?'

একটু চমকে মির্জা বললো, 'কে-কে?—কেন, আমার দাদামশাই আর স্ত্রী। আর কে থাকবে?'

বললুম, 'না। সে-কথাই জিগ্‌গেস করছিলুম।'

'আমার দাদামশাইকে দেখলে বুঝবে কতো সুন্দর তিনি! ফরাসি দেশ থেকে ফিরে ভেবেছিলুম তাঁর একটি পাথরের মূর্তি খোদাই করবো। কিন্তু তারপর আমার বিয়ে হোলো, আর, তারপর সব যেন গোলমাল হয়ে গেলো। মূর্তিটি আর তৈরি করা হয়নি অনেকদিন। কত রাতে স্বপ্ন দেখেছি, বুঝি শেষ হয়েছে সেই মূর্তি গড়া। জানতুম ঠিক আমার মনের মতন একটি মূর্তি গড়তে পারলে চারিদিকে হৈ-হৈ পড়ে যাবে।···অনেকদিন ভেবেছি কেবল সেই মূর্তির কথা: শাদা পাথরে খোদাই একটি শুভ্র মূর্তি।—আমার সেই স্বপ্ন সফল হয়েছে। তোমাকে আজ দেখাবো।'

আমি শুধু বললুম, 'ও।' কারণ, এ-সব ব্যাপারে আমার উৎসাহ বিশেষ নেই। সত্য কথা বলতে কি, এ-সব মূর্তি-টুর্তি আমি ভালো বুঝি না। বরাবরই দেখেছি, এগজিবিশনে আমার যে-সব ছবি ভালো লাগে সমঝদার লোকেরা সেগুলোকে যাচ্ছেতাই বলে, আর সমঝদারদের কাছে যে-সব ছবি উচ্চ প্রশংসা পায় সেগুলো আমার লাগে যাচ্ছেতাই। তাছাড়া ট্রেনে উঠে পর্যন্ত আমার শরীরটা বিশেষ ভালো লাগছিলো না। মাথার মধ্যে কেমন একটা টিপটিপে যন্ত্রণা বোধ করছিলুম। আর এমন একটা শীত-শীত লাগছিলো,

যেটা ঠিক ঠাণ্ডার জন্য নয়। আমার দিকে তার নীল চোখ তুলে কি যেন দেখে মির্জাও চুপচাপ জানলার বাইরে চেয়ে রইলো। ট্রেন যতো এগিয়ে চললো, আকাশ ততোই হয়ে আসতে লাগলো কালো। টিপিটিপি থেকে বৃষ্টি নামলো জোরে। শীতের ছোট্ট বেলা যেন এক চুমুকে শেষ করে দিলো দীর্ঘ কালো রাত। নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত লাগলো। ঘাড়ের কাছে ওভারকোটটা পুঁটলি পাকিয়ে হেলান দিয়ে ঢুলতে লাগলুম।

কতক্ষণ ঢুলেছিলুম কিংবা ঘুমিয়েছিলুম জানা নেই। চোখ মেলে দেখি মির্জা আমার কপালে হাত দিয়ে ঠেলছে। মির্জার হাতটা ভারি ঠাণ্ডা। সে বললো, 'এ কী প্রতুল! তোমার গা যেন গরম-গরম ঠেকছে!'

আমি বললুম, 'না-না। ঠিক আছে। কিন্তু কামরার আর লোকেরা কোথায়? গাড়ি থেমে রয়েছে কেন?'

হেসে সে বললো, 'আর সবাই তো নেমে গেছে। আমরা আগ্রায় পৌঁছেছি। চলো, নামা যাক।'

ওভারকোটে ভালো করে বোতাম এঁটে মাথায় টুপি দিয়ে মির্জার সঙ্গে নেমে এলুম। বৃষ্টি কিছু কমেছে। কিন্তু বাতাসে যেন শান দেওয়া। আর আকাশেও মেঘের কমতি নেই। ঘুমিয়ে উপকারই হয়েছিলো। মাথার যন্ত্রণা প্রায় নেই বললেই হয়। শরীরটাও বেশ হালকা-হালকা বোধ হোলো। একটু যেন বেশি রকম হালকা!

ইস্টিশান ছেড়ে আমরা বাইরে এলুম। বেশ রাত হয়েছে। একটিও টাঙা কিংবা ট্যাক্সি নেই। শুধু একটি বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। অদ্ভুত তার গড়ন। পুরনো আমলের জুড়ি গাড়ির মতো। এ-দেশে এ-ধরনের গাড়ি এই প্রথম দেখলুম। কাছে পৌঁছে দেখি গাড়ির ঘোড়াদুটো চমৎকার দেখতে। আবছা আলো-অন্ধকারে তাদের দুধে-ধোয়া শাদা রঙ স্পষ্ট চোখে পড়ে। মাঝে-মাঝে তারা পাথরে পা ঠুকছে, আর ছোটো-ছোটো স্ফুলিঙ্গ—

সোনালি আর নীল আর সবুজ—কয়েক মুহূর্তের জন্য উঠছে চমকে। একজন সহিস আমাদের সেলাম করে দরজা খুলে দাঁড়ালো। গায়ে দামি জরির পোশাক। গাড়ির ভিতরও চমৎকার। অনেকটা জায়গা। তুলতুলে নরম গদি। একফোঁটা ধুলো নেই। নানা ধরনের নরম রেশমের তাকিয়া। ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে বড়-জোর ফুলদানি দেখা যায়। কিন্তু আতরদানি দেখে সত্যিই খুব আশ্চর্য হলুম। বুঝলুম আমার এই নতুন বন্ধুটি নিশ্চয়ই কোনো নবাব বংশের ছেলে।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছুটলো। নিস্তব্ধ রাত্রিতে শুধু ঘোড়ার খুরের খুটখুট ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ইতিপূর্বে এখানে কখনো আসিনি। নিস্তব্ধ এক শীতের ঝোড়ো রাতে দুধের-মতো ঘোড়ায়-টানা চমৎকার জুড়িগাড়ির মধ্যে বসে আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন অসম্ভব, কেমন যেন স্বপ্ন-স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগলো। ভাবলুম মির্জার সঙ্গে একটু গল্প করি। কিন্তু এবার ঢোলবার পালা তার। জানলার পাশে মাথা রেখে সে ঢুলছে। গাড়ির মধ্যেকার একটি ছোটো ঝাড়লণ্ঠনের মোমের মতো নরম আলো তার মুখের একপাশে পড়েছে। তাকে আরও সুন্দর, আরো ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে। আমিও তার উদাহরণ অনুসরণ করলুম। ঢুলতে লাগলুম।

এবারেও কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম মনে নেই। জেগে উঠে দেখি জুড়ি-গাড়ি থেমেছে আর মির্জা ডাকছে। শরীরটা আরো হালকা, মাথার ভিতরটা আরো যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগলো। সহিস দরজা খুলে দিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নামলুম। কিন্তু এ এলুম কোথায়? তখন মাঝ রাত। একটি নিস্তব্ধ রাজপ্রাসাদের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে দূরের গাছগুলো দুলছে, আর বাতাসের তীক্ষ্ণ শিস রাতকে যেন করাত দিয়ে চিরছে। হু-হু করে উড়ে যাচ্ছে মেঘের পর মেঘ। আর শাদা ঘোড়াদুটো উত্তেজিত হয়ে মাঝে-মাঝে

পাথরে পা ঠুকছে, আর ঠিকরে পড়ছে আগুনের স্ফুলিঙ্গ—সোনালি, নীল, আর সবুজ। শ্বেত পাথরের প্রাসাদে মির্জার পিছন পিছন চললুম। সে যেন আরো গম্ভীর, আরো অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে। কোনো কথা বলতে ইচ্ছে হোলো না। সমস্ত শরীর অস্বাভাবিক হালকা। মহলের পর মহল পেরিয়ে চললুম। সামনে মশালের আলো দেখিয়ে চলেছে জরির উর্দিপরা চাকর। আমাদের চলন্ত ছায়া মাঝে মাঝে পাথরের দেয়ালের উপর বড় হয়ে পড়ে কাঁপছে। চুপচাপ শুধু এগিয়ে চললুম। কতোক্ষণ জানি না। শেষে, মহলের পর মহল পার হয়ে নানা ঘোরানো-পাকানো সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। দরজার পাশে মশাল হাতে মাথা নিচে করে চাকর দাঁড়িয়ে রইলো। মির্জা দরজা খুলে আমাকে ইঙ্গিতে বললো আসতে।

ঘরের মধ্যে এসে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। বিরাট সেই হলঘর। মেঝেতে পুরু দামি গালচে, ছাত থেকে অসংখ্য ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে, আর তাদের শাদা আলোয় সমস্ত ঘর জুড়ে যেন উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। একপাশে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে এক শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, সামনে স্ফটিক পাত্রে রঙিন পানীয়। শাদা মসলিনের চুড়িদার পাজামা ও পাঞ্জাবি পরনে। মাথার শাদা চুল পিঠ পর্যন্ত নেমে এসেছে, শাদা দাড়ি নেমেছে বুক পর্যন্ত। টকটকে রঙ, ফরসা নয়, ঈষৎ লালচে। চোখদুটো নীলার মতো নীল। পাশেই আতরদানি। একটি সোনার থালায় স্তূপ-করা মোহর ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় ঝকঝক করছে। সেই বৃদ্ধের কিছু দূরে আর-এক বৃদ্ধ সেতার বাজাচ্ছে—আর কিছু দূরে একজন নর্তকী নাচছে। তার রেশমের ওড়না উঠছে ফুলে-ফুলে; তার ঠোঁট ডালিমের মতো রাঙা, তার রঙ হাতির দাঁতের মতো শাদা। তার মাথার চুল বিনুনি করে বাঁধা। কালো সাপের মতো সেই বিনুনি-বাঁধা চুল এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধে, পিঠে বুকে পড়ছে

ঝাঁপিয়ে। নীল সমুদ্রের মতো মাঝে-মাঝে ফুলে-ফুলে উঠছে তার নীল রঙের ঘাগরা। তার ঘুঙুরের শব্দে এই রাত্রির, এই সভাঘরের এই প্রাসাদের বুকে যেন নেশা ধরেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনে হোলো হঠাৎ যেন ইতিহাসের হাজার-হাজার পাতা উল্টে গেছে, আর আমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি এক মোগল-বাদশার রাজসভায়।…

আমাদের কেউ যেন দেখেও দেখলো না। সেই বৃদ্ধ সোনার থালা থেকে একমুঠো মোহর নর্তকীর পায়ের তলায় ছড়িয়ে দিলো। তারপর আতরদানি থেকে আতরের পাত্র তুলে নিজের দাড়িতে মাখালো। সমস্ত বাতাস সুগন্ধে ভারি হয়ে গেলো, আর আমি স্পষ্ট দেখলুম মেয়েটি ঢেউয়ের ভঙ্গিতে একটি ফুলের স্তূপের মতো ভেঙে পড়ে বৃদ্ধকে অভিবাদন করলো, কিন্তু তার আগে মির্জার দিকে তার বড়-বড় ভ্রমরের মতো চোখদুটি তুলে মুহূর্তের জন্য হাসলো। অপূর্ব সেই হাসি। সেই মৃদু চকিত হাসির কোনো বর্ণনা নেই। কিন্তু সেই হাসির জন্য, মনে হোলো, আজীবন মরুভূমির উপর দিয়ে হাঁটা যায়, সমুদ্রের পর সমুদ্র যায় পেরুনো।

মির্জা ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়ে কুর্নিশ করে সরে দাঁড়ালো। তারপর ইঙ্গিতে ডাকলো আমাকে। বৃদ্ধ আমার দিকে তার নীলার মতো উজ্জ্বল চোখ তুলে ধরলো। আমার বুকের ভিতরটা সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে ধ্বক-ধ্বক করে উঠলো। ভয়ে-ভয়ে এগিয়ে এলুম। কুর্নিশ করতে জানি না। কিন্তু কিছু একটা করা উচিত। নিচু হয়ে বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম। আর, সেই মুহূর্তে, চারদিক যেন তোলপাড় হয়ে গেলো। ঝনঝন করে যেন ভেঙে গেলো হাজার-হাজার কাঁচের বাসন। একটার পর একটা ঝাড়লণ্ঠন গেলো নিভে। আর আশ্চর্য, হাত আমি সরাতে পারলুম না। দেখলুম যার পায়ে হাত দিয়েছি, সেই বৃদ্ধ মানুষ নয়, শ্বেতপাথরে খোদাই-করা একটি মূর্তি। এতক্ষণ সজীব ছিলো, কিন্তু আমার স্পর্শে

পলকের মধ্যে যেন তার সর্বাঙ্গ জমে পাথর হয়ে গেছে; তার নীলার মতো চোখদুটি শাদা। তার ধূর্ত হাসিটি পর্যন্ত এই মর্মর মূর্তির উপর ধরা পড়েছে।...ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হোলো সেই সভা, সেই প্রাসাদ, সেই প্রহরীরা। দেখলুম, বিরাট ধূ-ধূ এক দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের মাঝে মধ্যরাত্রে আমি আর মির্জা, আর একটি শ্বেত-পাথরের মূর্তি। আর একটি অদৃশ্য মেয়ের ঘুরে বেড়ানো। কখনো তার রেশমি ঘাগরার সামান্য আভাস, কখনো তার ঘুঙুরের মৃদু ধ্বনি, কখনো শুধু সেই আশ্চর্য হাসি অন্ধকার রাত্রির বুকে।...আকাশে হু-হু করে মেঘের পর মেঘ উড়ে যাচ্ছে, আর অন্ধকার গাছে বাজছে বাতাসের শিস। আর আমি নতজানু হয়ে সেই মর্মর মূর্তির আঙুলে স্পর্শ করে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে বসে আছি। সমস্ত শরীর শিউরে-শিউরে উঠছে। কিন্তু ভয় নেই।

মির্জা বললো, 'ওঠো বন্ধু।...এই আমার দাদামশাই। আর, যে-মেয়েটি নাচছিলো—যাকে এখন ভালো করে দেখা যাচ্ছে না—সে-ই আমার স্ত্রী।...ও একদিন আমার দিকে চেয়ে হেসেছিলো, আর আমি তাই সমস্ত পৃথিবীকে উপেক্ষা করে লুকিয়ে এক রাত্রে ওকে বিয়ে করেছিলুম। সেই রাতটাও ছিলো এইরকমই এক ঝড়ের রাত। সেই রাতেও বারোটার সময় চাঁদ ওঠবার কথা ছিলো।...কিন্তু সে চাঁদ ওঠেনি। না আমাদের জীবনে, না নীল আকাশকে আরো নীল করে।...আমার দাদামশাই ছিলেন অত্যন্ত চালাক লোক। তাঁর ওই নীলার মতো নীল চোখে ধুলো দেবো এমন ক্ষমতা কোথায়? আমরা আর সূর্যের আলো দেখতে পেলুম না।...কিন্তু বড় শখ ছিলো তাঁর একটি মূর্তি গড়বো: শাদা পাথর কেটে অমর করবো দাদামশাইকে। আর সেইসঙ্গে অমর হবে আমার নাম।...আমরা আজ পৃথিবীতে কেউ নেই। কিন্তু আমার সেই কামনার, সেই আন্তরিক ইচ্ছের মৃত্যু এখনো হয়নি। বারবার ফিরে-ফিরে আসে।...তাই, বন্ধু, তোমাকে আজ দেখাতে এনেছিলুম আমার

সেই মর্মর স্বপ্ন।···তোমার জন্য গাড়ি ঠিক আছে। কোনো ভয় নেই। ঠিক জায়গায় তোমাকে নামিয়ে দেবে।······

মন্ত্র-চালিতের মতো আমি সেই শাদা ঘোড়ার জুড়িগাড়িতে উঠলুম। ঘোড়ার খুরে-খুরে জ্বলে উঠলো স্ফুলিঙ্গ: সোনালি আর নীল আর সবুজ। আর, সেই শীতের রাতের ঝোড়ো অন্ধকারের বুকে আমি স্পষ্ট দেখলুম দুটি ভ্রমর-কালো চোখ আর একটি বর্ণনা-হীন হাসি! খুটখুট করে শুধু ঘোড়ার খুরের শব্দ। অন্ধকার ঝড়-বৃষ্টির রাত। গাড়িতে একা। সমস্ত শরীর ভারী হয়ে আসতে লাগলো। মাথার মধ্যে আবার শুরু হোলো সেই যন্ত্রণা। আর ঘুমে ভেঙে পড়লো সারা শরীর। কপালে একবার হাত দিয়ে দেখলুম, যেন পুড়ে যাচ্ছে।······

সকালে ঘুম ভাঙলো, দেখি আগ্রা ইস্টিশানের ওয়েটিং রুমে শুয়ে আছি। জ্বর নেই। সমস্ত শরীর দুর্বল আর হালকা। মুখের ভিতরটা বিস্বাদ। আকাশে ঝড়-বৃষ্টির চিহ্নও নেই—কনকনে ঠাণ্ডা আর উজ্জ্বল উষ্ণ সোনালি সূর্য।

কলকাতায় আমার এই কাহিনী কেউই বিশ্বাস করলো না। এক ডাক্তার-বন্ধু বললেন, 'একটা ছোট্ট মশা তোমাকে নিশ্চয়ই একদিন কামড়েছিলো। ফলে ম্যালেরিয়া জ্বরের ঘোরে একটা মস্ত আজগুবি কাণ্ড স্বপ্নে দেখেছো।'

॥ ঘনশ্যামের ঘোড়া ॥

শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম মণ্ডল সকাল বেলায় খবরের কাগজ সহযোগে চা পান করছিলেন, অর্থাৎ খবরের কাগজ পড়ছিলেন ও চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলেন। পাশের জানলা দিয়ে তাঁর পায়ের কাছে পোষা কুকুরের মতো সকালবেলার মিষ্টি রোদটুকু লুটিয়ে পড়েছে। এমন সময় পুরনো চাকর মুখ কাঁচুমাচু করে এসে দাঁড়ালো, এবং গলার স্বরকে যতদূর সম্ভব করুণ করে আর্তস্বরে বললো, 'কত্তাবাবু, সব্বোনাশ হয়েছে!'

কর্তাবাবু খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে চশমাকে কপালে ঠেলে কটমট করে তাকালেন। অর্থাৎ, কী হয়েছে ভূমিকা ছেড়ে বল।

খানিক ইতস্তত করে চাকর বললো, 'হুজুর! এই মাত্তোর থানা থেকে খবর আনলুম—বোপদেব মারা গেছে।'

'কী!' ভূমিকম্পের পাহাড়ের মতো শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম মণ্ডল কাঁপতে লাগলেন। 'কী বললি?—বোপু মরে গেছে?' আর তারপর যা ঘটলো, তা বর্ণনা করা শক্ত। তিনি চায়ের পেয়ালাটা ছুঁড়লেন চাকরের উদ্দেশে, বোপদেবের মৃত্যুর কারণ যেন সে নিজে। কিন্তু বুদ্ধিমান চাকর একটা অঘটনের ভয়ে আগেই সরে পড়েছিলো। ...তারপর চেয়ার উল্টোলো, টেবিল ভাঙলো, খবরের কাগজ হোলো টুকরো-টুকরো, এবং মিনিট-দশেকের মধ্যেই সমস্ত পাড়া জানতে পারলো বোপদেবের মৃত্যুর হৃদয়-বিদারক খবর।

বোপদেব কর্তাবাবুর আদরের ঘোড়া।

এই অঘটনের যথার্থ কারণ জানতে হলে আমাদের অনেকটা পিছিয়ে যেতে হবে:

গ্রামটির নাম চন্দনপুর। এখানে অবস্থাপন্ন বাসিন্দাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম মণ্ডল এবং নিত্যধন লাহিড়ী। কেউই কারুর আঁচ সহ্য করতে পারেন না, এবং দু জনেই পরস্পরের নিন্দে করতে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। প্রত্যেকে সুযোগ পেলেই বিপক্ষকে নিজের চেয়ে ছোটো বলে প্রমাণ করেন।

ঠিক মাসসাতেক আগে চন্দনপুর থেকে পাঁচ মাইল দূরে নন্দনপুরে একটা প্রকাণ্ড মেলা বসে। আশেপাশের গ্রাম এই মেলার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো। ঘনশ্যাম ও নিত্যধনও শুনলেন সেই মেলার কথা, আর, এমনি দুর্ভাগ্য যে দু জনে ঠিক একই দিনে মেলা দেখতে বেরুলেন।

দুপুর তখন বারোটা। ঘনশ্যাম স্নান করে ভাত খেয়ে পান চিবুতে-চিবুতে নিজের অতি আদরের ঘোড়া বোপদেবের পিঠে চেপে বসলেন ও মাথার উপর একটি ছাতি খুলে যাত্রা শুরু করলেন। প্রায় মাঝপথে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে নিত্যধনের দেখা, তিনিও চলছেন মেলায়, তবে পায়ে হেঁটে—বোপদেবের মতো ঘোড়া তাঁর নেই: তাঁর দুটো গোরু ও একটা বলদ আছে, এবং বলদটিকে তিনি মানিক বলে ডাকেন। ঘনশ্যামের এই ঘোড়ার জন্যে যথেষ্ট গর্ব এবং ঘোটকহীন নিত্যধনের চেয়ে তিনি যে ধনে এবং মানে বড়, প্রায়ই সে-কথা ঘোষণা করে থাকেন। আজ এই অবস্থায় নিত্যধনকে দেখে তিনি একটু মুচকি হাসলেন এবং খোঁচা দিয়ে বললেন, 'কী হে ভায়া! বলি তোমার মানিকের কী হোলো? তার পিঠে চড়লেই তো পারতে!'

এই খোঁচায় নিত্যধনের সর্বাঙ্গ রী-রী করে জ্বলে উঠলো, এবং সেটাকে সম্পূর্ণ হজম করতে না-পেরে মুখটাকে কুঁচকে এবং আধহাত পরিমাণ জিভ বার তার মৌন প্রত্যুত্তর জানালেন। ঘোড়ার পিঠে বসে ছাতিটাকে বন্ধ করে ঘনশ্যামও দু-হাতের সংযোগে একটি নিখুঁত বক দেখালেন।

নিত্যধনের আজ এই মেলায় আসার একটা গুপ্ত কারণ ছিলো।

সত্যি বটে তাঁর ঘনশ্যামের মতো ঘোড়া নেই, কিন্তু একটা প্ল্যান তাঁর মাথায় এসেছে যাতে অতি সহজেই তিনি ঘনশ্যামকে পরাস্ত করতে পারবেন। প্ল্যানটা আর কিছু নয় : সেবার কলকাতায় এসে তিনি চাঁদনি থেকে তাঁর মাপের একটি স্যুট করে আনেন, শোলার হ্যাটও বাদ দেননি সেই সঙ্গে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিছানার ভেতরে শোলার টুপি আবার তুবড়ে গিয়ে টুপির টুপিত্ব আর ছিলো না। আজ তিনি মেলায় চলেছেন, যদি সেখানে শোলার টুপি পাওয়া যায়। এই টুপি হলেই তিনি নিখুঁত সায়েব হয়ে চন্দনপুরকে তোলপাড় করে ছাড়বেন, এবং পরাজিত ঘনশ্যামের মুখ যে আরো গোলাকার হয়ে উঠবে তাতে তাঁর সন্দেহ নেই।

নিত্যধন যখন মেলায় এসে পৌঁছলেন, তখন প্রায় বিকেল। অনেক লোক এসেছে। চারদিক গমগম করছে সেই ভিড়ে। ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ তিনি পুলকিত হয়ে উঠলেন—সামনেই টুপির দোকান। ভালো দেখে একটা টুপি পছন্দ করে তিনি জিগগেস করলেন, 'দাম কতো হে?'

'আজ্ঞে, আড়াই টাকা।'

'অ্যাঁ, আড়াই টাকা? বলো কী! এক টাকায় হবে?' দোকানদার ভালো করে নিত্যধনকে দেখলো, তারপর পাশের কুমোরের দোকানটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'যান বাবু উই দোকানে। দু-পোয়সায় একটা হাঁড়ি মিলবে—মাথায় দেওয়া যাবে, চিঁড়ে ভি ভিজবে!'

নিত্যধন এই অপমানে রেগে টং হয়ে উঠলেন এবং অন্য টুপির দোকানের খোঁজে সশব্দে সে-জায়গা ত্যাগ করলেন।

ঘনশ্যাম মণ্ডল অনেক আগেই মেলায় এসে পৌঁছেছিলেন। ঘোড়াটাকে কাছের একটা গাছে বেঁধে তিনিও মেলার ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

এদিকে হয়েছে কি, হারু বাগদি ঠিক সেইদিন জেল থেকে ছাড়া

পেয়েছিলো। পকেট-কাটার অভিযোগে এই নিয়ে সে পঞ্চমবার জেল খাটলো। হাতে তার পয়সাকড়ি কিছুই নেই। তাই সে-ও আজ এই মেলায় এসেছে যদি সৎ-উপায়ে কিছু রোজগার করা যায়। কিন্তু লোকগুলো আজকাল বেজায় সেয়ানা হয়ে গিয়েছে! কিছুতেই হারু সুবিধে করতে না-পেরে একটা গাছের তলায় এসে বসলো। এই গাছেই ঘনশ্যাম বোপদেবকে বেঁধে মেলা দেখতে গিয়েছেন। খানিক এদিক-ওদিক চেয়ে হারু বাগদি লাফিয়ে উঠলো, এবং চিৎকার করে বলে চললো, 'খুব শোস্তায় ঘোড়া যাচ্ছে বাবু। ছো-টাকা— ছো-টাকা···!' মেলায় অনেক রকম জীব-জন্তু বিক্রি হচ্ছিলো, তাই এই ঘোড়া বিক্রির ব্যাপারটা মোটেই বেমানান হোলো না।

এদিকে নিত্যধন আর টুপির দোকানের খোঁজ না-পেয়ে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঘোড়ার সুলভ মূল্য শুনে লাফিয়ে উঠলেন এবং হারুর কাছে এসে ঘোড়াটাকে কেনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

ঘোড়াটার পিঠ চাপড়ে হারু বললো, 'কিরে, হাওয়ার মতো উড়বি?' তারপর নিত্যধনের দিকে চেয়ে বললো, 'বাবু, এ পোক্ষী-রাজের বাচ্চা। ··ছো-টাকা, ছো-টাকা।'

ঘোড়াটা চিঁ-হি-হি করে হারুর কথার সমর্থন করলো, এবং নিত্যধন আর বাক্যব্যয় না-করে ছ-টাকায় ঘোড়াটা কিনে ফেললেন। টাকাগুলো হারু বেশ ভালো করে বাজিয়ে নিলো। তারপর একটা সবিনয় নমস্কার জানালো, এবং দু'বার নাগরদোলায় ঘুরে, চার আনার আলু-কাবলি খেয়ে মুখ মুছতে-মুছতে নির্বিঘ্নে মেলা পরিত্যাগ করলো।

এদিকে হয়েছে কি, ঘনশ্যাম নিজের ঘোড়া নিতে এসে দেখলেন সেটা নেই, এবং কিছু দূরেই দেখলেন নিত্যধন তাঁরই ঘোড়ায় চড়ে তাঁকেই বক দেখাচ্ছেন।

তারপর যা হোলো, তা আর না-ই লিখলুম! ঘটনাস্থলে পুলিশ এলো, ঘোড়াটাকে তারাই নিয়ে গেলো।—গত সাত মাস ধরে

নিত্যধন আর ঘনশ্যাম এই ঘোড়াটার জন্য পরস্পারের বিরুদ্ধে মামলা করে দিন কাটাচ্ছিলেন।

গতকাল মামলার রায় বেরিয়েছে : ঘনশ্যাম জয়ী হয়েছেন। আজকে ঘোড়াটা পাবার কথা—আর আজই কিনা অতো দুঃখের বোপদেব মারা গেলো! ঘনশ্যামের কান্না পেলো।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তখনো শেষ হয়নি! খানিক পরেই পুলিশ-আপিস থেকে তাঁর কাছে একখানা চিঠি এলো : সাত মাস ধরে ঘোড়াটাকে খাওয়াতে মাসে দশ টাকা করে খরচ পড়েছে। আদেশ—সেই টাকা যেন অবিলম্বে পাঠানো হয়!!

॥ বিল্লুর জ্যাঠামনি ॥

বিল্লুর বাবা ইস্টিশান থেকে ফিরে এসে বললেন, 'যা ভেবেছিলুম তাই! বড়দার তো আর এখন পর্যন্ত মাথার ঠিক হোলো না। লিখেছিলেন দিল্লি মেলে আসছেন, আসলে হয়তো আসবেন পাঞ্জাব এক্সপ্রেস কিংবা তুফানে। ওরে বিল্লু, তুই যেন আজ বাড়ি থেকে বেরুসনি। কখন যে বড়দা পৌঁছবেন ঠিক নেই। আমি একটু বেরুচ্ছি। বড়দা এলে রামুকাকার বাড়ি থেকে ডেকে আনিস।'

এই বলে বিল্লুর বাবা প্যাঁচার মতো ব্যাজার মুখ করে চক-চক করে ত্থ' পেয়ালা চা গিলে সোজা চলে গেলেন রামুবাবুর বাড়ির তাসের আড্ডায়। এদিকে বিল্লু প্যাঁচার মতো মুখ করে বাড়িতে বসে রইলো।

বিকেল গেলো, সন্ধে গেলো। ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাওয়া গেলো না। সন্ধেয় কথা ছিলো খেলার মাঠ থেকে সটান রতনাদের বাড়িতে সিনেমা দেখার। রতনার মামা মানস-সরোবর থেকে মুভি-ছবি তুলে এনেছেন। রতনার বন্ধু-বান্ধবদের আজ দেখাবেন। সবই আজ মাঠে মারা গেলো। কোথায় বা বিল্লুর জ্যাঠা, কোথায় বা কে!

রাত আটটার সময় বিল্লু বললো, 'মা,—জ্যাঠামনি তো আজ আসবেন বলে মনে হয় না। ট্রেনের সময়ও পার হোলো। আমি একটু বেড়িয়ে আসবো?'

মা জবাব দিলেন, 'আজকাল কি আর ট্রেনের সময় বলে কিছু আছে? হয়তো তিন ঘণ্টা লেট করে গাড়ি আসবে!'

অতএব বিল্লুকে সিনেমা দেখার লোভও সামলাতে হোলো।

রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় তার বাবা তাসের আড্ডা থেকে ফিরে

ধমকে বললেন, 'শুধু-শুধু বসে আছিস? একটা বই খুলে বসতে কী হয়েছিলো?'

যেন বই খুলে বসলেই বিল্লুর পড়া হোতো!

পরের দিন তিনতলার পড়ার ঘরের দেয়ালে হেলানো চেয়ারে বসে বিল্লু একটা ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ছিলো। ছুটির দিনে ডিটেকটিভ বই পড়ার মতো মজা আর কিছু নেই। এমন সময় এক-তলায় শুনতে পেলো বেজায় একটা হৈ-চৈ, হাঁকডাক।

হুড়হুড় করে সে নেমে এলো নিচে। দেখলো তার জ্যাঠামনি এসেছেন। চুল উস্কোখুস্কো, ট্রেনের ময়লা জামাকাপড় পরনে, ঘরের মধ্যে স্যুটকেস, বেডিং, জলের কুঁজো, কয়েকটা পুঁটলি, ছাতা-লাঠি—লণ্ডভণ্ড করে নামানো। ভোলা চাকর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে। কোমরে ময়লা গামছা জড়ানো খালি-গা রিক্সাওলা চকচকে সিকি-সমেত হাতের তালুটা তার জ্যাঠামনির দিকে প্রসারিত করে বলছে, 'হুজুর, টেরাম রাস্তাসে...'

বিল্লু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই খেঁকিয়ে উঠে তার জ্যাঠামনি বললেন, 'টেরাম রাস্তা তো কি? চার আনা বহুৎ হুয়া। ভাগো!—যাবি না? আচ্ছা জ্বালা তো!' বলে আরো একটা দো-আনি ব্যাগ থেকে বার করে বিল্লুর হাতের তালুর উপর রেখে বললেন, 'ভাগ। আর বকবক করিস নে।' তারপর রিক্সাওলার দিকে চেয়ে বললেন, 'থাক-থাক! হয়েছে, হয়েছে! বাড়ির সব খবর ভালো তো?'

বিল্লু আর রিক্সাওলা পরস্পরের দিকে খানিক ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। তারপর ফিক করে হেসে রিক্সাওলা বিল্লুর হাতের তালু থেকে দো-আনিটা টপ করে তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেলো।

ছোটো অ্যাটাচি কেসটা হাতে নিয়ে জ্যাঠামনি বললেন, 'চল বিল্লু। তোর বাবার যেমন কাণ্ড! চিঠি লিখলুম ইস্টিশানে থাকতে, তা বাবুর দেখা নেই। মস্ত সায়েব হয়ে গেছেন!'

'আপনার চিঠি পেয়ে বাবা তো কাল ইস্টিশানে গিয়েছিলেন...'

'কাল? কাল কেন? তাই লিখেছিলুম বুঝি? দেখো কাণ্ড! মঙ্গলবার লিখতে সোমবার লিখে বসে আছি!'

বিল্লুর মা মাথায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করে চাপা গলায় জিগ্‌গেস করলেন, 'দিদির শরীর ভালো আছে তো? ফণি কেমন আছে?'

'আর বোলো না বৌমা ওদের কথা। চেয়ারে বসে জামার বোতামগুলো খুলে তিনি সর্বাঙ্গে হাওয়ার প্রবেশ-পথ করে দিলেন। 'ভালো থাকার জো কি? খেলতে গিয়ে তো তোমার দিদি পা মচকে এসেছে আর ফণি—'

বাধা দিয়ে বিল্লুর মা বললেন, 'খেলতে গিয়ে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, রোজ ফুটবল না খেললে যে বাবুর ঘুম হয় না! লেখা-পড়া শিকেয় উঠেছে। রাতদিন ফুটবল আর ফুটবল—'

'কার, ফণির কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ফণির কথাই তো বলছি—যাক গে, ভালোই হয়েছে। দু'দিন বিছানায় পড়ে থাকলে একটু শিক্ষা হবে। একটু চা চড়াও বৌমা। আমি ততক্ষণ স্নান সেরে নি।'

বিল্লুর মা তাঁর দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে চলে গেলেন। বিল্লু রইলো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে। তার বাবার এই জ্যাঠতুতো দাদাটির সঙ্গে সজ্ঞানে এই তার প্রথম দেখা।

বিল্লুর বাবা যখন ফিরলেন, বিল্লু তখনো তার জ্যাঠামনির কাছে দিল্লির গরম আর ট্রেনের ভিড়ের কথা কম করে পঁচিশবার শুনেও আবার শুনতে-শুনতে হাঁপিয়ে উঠেছে। প্রণাম করে বিল্লুর বাবা বললেন, 'ভালো আছো তো বড়দা? মনিদার ছেলের খবর শুনে—'

'আর বলিস নে। ভেরি স্যাড—টাইফয়েডে একুশ দিনের দিন মারা গেলো।' বললেন বিল্লুর জ্যাঠামনি।

বিল্লু আর তার বাবা ফাঁকা চোখে তাকিয়ে রইলো। মনিবাবু বিল্লুদের গ্রামের লোক। আত্মীয়ের চেয়েও বেশি। তিনিও দিল্লিতে

থাকেন। এই বছর তাঁর ছেলে দিল্লি ইউনিভারসিটি থেকে ম্যাট্রিকে সেকেণ্ড হয়েছিলো। বেচারার পাশের খবর শুনেছিলো, তারা মৃত্যুর খবর শোনে নি।

আমতা-আমতা করে বিল্লুর বাবা বললেন, 'কই, অসুখের খবর তো শুনি নি! মনিদা—আহা! বেচারার যে ঐ এক ছেলে! খুব মুষড়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই—'

বিল্লুর জ্যাঠামনি পিছন ফিরে স্যুটকেস গোছাচ্ছিলেন। বিল্লুর বাবার কথা শুনে ফিরে বললেন, 'মুষড়ে পড়বে কেন? তোর কি মাথার ঠিক নেই? ছেলে স্কলারশিপ পেলে কেউ মুষড়ে পড়ে? বিল্লু ভালো করে পাশ করলে তুই মুষড়ে পড়বি? সবাই তো আর তোর মতো বাবা হয় না!' তাঁর মুখচোখে আন্তরিক বিরক্তির ছাপ। 'দিনকের-দিন তুই যেন একটা কী হয়ে পড়ছিস!'

'এই যে বললে মনিদার ছেলে মারা গেছে—'

'আহা মনি নয়, পানু—তার পাশের বাড়িতে থাকে। তাকে তুই চিনিস না। পানুর ছেলে টাইফয়েডে মারা গেছে। মনির ছেলে সেকেণ্ড হয়েছে। কি শুনতে যে কী শুনিস তোরা—!'

বিল্লুর বাবার আতঙ্কিত মুখে চাপা হাসির রেখা দেখা দিলো। বিল্লুও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু সে ভেবে পেলো না সত্যিই তার ভুল শুনেছিলো কি না!

তিন দিন পরে বিল্লুর কলেজ খুললো। এই প্রথম সে কলেজে চলেছে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সবাইকে সে প্রণাম করলে, জ্যাঠামনিকেও। তিনি বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা, জ্ঞানী হও, গুণী হও। দেশের মুখ উজ্জ্বল কর, দশের মুখ উজ্জ্বল কর।—কিন্তু ভালো কথা, দুপুরের ট্রেনেই যে আমি বর্ধমান যাচ্ছি। কলকাতার কাজ শেষ হয়েছে। বর্ধমান থেকেই সোজা চলে যাবো দিল্লি।'

'তাহলে আপনার সঙ্গে কি যাবার আগে আর দেখা হবে না?'

'হবে—হবে, হতেই হবে। দুটো টুথ-ব্রাস আর কে, সি, দাসে

টিনে-ভর্তি রসগোল্লা নিয়ে তুই ঠিক সাড়ে তিনটের সময় এগারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছবি। তিনটে পঁয়তাল্লিশের গাড়ি। মনে থাকবে তো ?'

জিনিস কেনবার জন্যে একটা দশ টাকার নোট তিনি বিল্লুকে দিলেন। মনিব্যাগে ভরে বিল্লু কলেজে গেলো। ঠিক দুটোর সময় কলেজ থেকে বেরিয়ে হ্যারিসন রোডের মনিহারি দোকান থেকে টুথ-ব্রাস কিনে সে এসপ্লানেডে ; সেখানে কে, সি, দাসের দোকান থেকে টিনে-ভরা রসগোল্লা কিনে ট্রামে চড়ে এলো হাওড়ায়। তখন সোয়া তিনটে। প্লাটফর্ম টিকিট কেটে এগারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকে ট্রেনটা তন্নতন্ন করে সে খুঁজলো। কিন্তু কোথাও তার জ্যাঠামনির চিহ্ন নেই। আগে এসে পড়েছে ভেবে একটা বেঞ্চিতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো বিল্লু।

কিন্তু কোথায় তার জ্যাঠামনি ? ট্রেন ফেল করবেন নাকি ? ভুল করেন নি তো ?

কথাটা মনে হতেই লাফিয়ে উঠে উল্টো দিকের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো রাঁচির ট্রেনটা খুঁজতে লাগলো বিল্লু।

যা ভেবেছিলো তাই। একটা ফাঁকা দেখে ইণ্টার ক্লাসের কোনের বেঞ্চিতে বিছানা খুলে হেলান দিয়ে বসে, তার জ্যাঠামনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওডহাউসের কি-একটা হাসির বই পড়ছেন আর মুচকে-মুচকে হাসছেন।

হন্তদন্ত হয়ে কামরায় উঠে বিল্লু বললো, 'জ্যাঠামনি, একি ? কোথায় যাচ্ছেন ? কখন এলেন ?'

'ঠিক পৌনে তিনটেয় এসেছি। ভাবলুম তুই বুঝি আর এলিই না! তোদের সব যেমন কাণ্ড! আচ্ছা ভুলো হয়েছিস যা-হোক!'

'কিন্তু এ গাড়ি যে রাঁচি যাবে!'

'রাঁচির গাড়ি রাঁচি যাবে তাতে এমন অবাক হচ্ছিস কেন ?'

'এই যে বললেন বর্ধমানে যাবেন ?'

'বর্ধমানেই তো যাবো!—বেশ ফাঁকা দেখে কামরা পেয়েছি বলে বুঝি

তোর পছন্দ হচ্ছে না ?' তিনি একটু রসিকতা করতে চেষ্টা করলেন।

'না, তা নয়। রাঁচির গাড়ি তো আর বর্ধমান যাবে না! বর্ধমানের গাড়ি ওই দেখুন সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফার্স্ট-বেল পড়ে গেছে। ছাড়লো বলে।'

'তাইতো, তাইতো ! এ যে ভয়ানক কথা ! কুলি—এই কুলি...'

কোনো রকমে বিছানাটা পাকিয়ে তাড়াহুড়ো করে, হোঁচট খেয়ে, বিষম খেয়ে—বিল্লু, তার জ্যাঠামনি আর কুলিতে মিলে যখন বর্ধমানের গাড়িতে মালপত্র তুললো তখন শেষ ঘণ্টা পড়ে গেছে, গার্ড-সায়েবের হুইসল শোনা যাচ্ছে।

কোমরে ময়লা গামছা-জড়ানো লাল ফতুয়াপরা কুলি চকচকে সিকি-সমেত হাতের তালুটা তার জ্যাঠামনির দিকে প্রসারিত করে বললে, 'হুজুর, আপ মা-বাপ হুজুর, খালি চার-অ আনা হুজুর...'

বিল্লু পায়ে হাত দিয়ে বিদায়-প্রণাম সেরে নিতেই, খেঁকিয়ে উঠে তার জ্যাঠামনি বললেন, 'হুজুর মা-বাপ তো কী ? চার-আনা বহুৎ হুয়া। ভাগো।—যাবি না ? আচ্ছা জ্বালা তো ?' বলে আরো একটা দো-আনি ব্যাগ থেকে বার করে বিল্লুর হাতের তালুর উপর দিয়ে বললেন, 'ভাগ। আর বকবক করিস নে !'

তারপর কুলির থুতনিতে হাত দিয়ে সেই হাতটা নিজের ঠোঁটের কাছে এনে চুক করে একটা শব্দ করে বললেন, 'থাক বাবা থাক ! অতবার প্রণাম কেন ? হয়েছে হয়েছে ! জ্ঞানী হও, গুণী হও ! দেশের মুখ উজ্জ্বল করো—' বলতে-বলতে তিনি চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়লেন।

বিল্লু আর কুলি পরস্পরের দিতে খানিক ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। তারপর ফিক করে হেসে লাল ফতুয়া পরা লোকটা বিল্লুর হাতের তালু থেকে দো-আনিটা টপ করে তুলে নিয়ে স্রেফ হাওয়া হয়ে গেলো।

॥ অ্যাটাচি কেস ॥

একটা চাকরি পেয়ে সেবার প্রথমে দিল্লি যাচ্ছি।

আজকাল যে-রকম ট্রেনে ভিড় তখন সে-রকম মোটেই ছিলো না। তা ছাড়া বার্থ রিজার্ভ করলে কলকাতা থেকে দিল্লি এই দীর্ঘ পথ বেশ আরামে শুয়ে-বসে যাবার সঠিক প্রতিশ্রুতি পাওয়া যেতো। তুফান মেলে একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরার বার্থ রিজার্ভ করে আমি এক রকম নিশ্চিন্তই ছিলুম। তবু যখন ইস্টিশানে পৌঁছলুম গাড়ি ছাড়তে তখনো প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরি। দেখলুম আমি যে সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় বার্থ পেয়েছি সেটাতে অন্য কারুর নাম নেই। কামরাটাও ফাঁকা ছিলো। আমিই প্রথম যাত্রী সেই কামরায় ঢুকলুম এবং ফাঁকা গাড়ি দেখে মনটাও বেশ ফাঁকা-ফাঁকা হালকা-হালকা লাগলো।

কুলিকে দিয়ে নিচের বার্থে আবার বিছানাটা ভালো করে পাড়ালুম, যে-সামান্য জিনিসপত্র ছিলো সেগুলো সাজিয়ে রাখালুম, তারপর তাকে একটা সিকি বকশিস দিয়ে যখন বিদেয় করলুম, গাড়ি ছাড়তে চল্লিশ মিনিট বাঁকি আছে। করকরে আর কিছু না থাকায় জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্ল্যাটফর্মে কোনো পরিচিত লোক আছে কি না দেখতে লাগলুম এবং সে-রকম কাউকেই দেখতে না পেয়ে এক চা-ওলাকে ডেকে এক ভাঁড় চা খেলুম এবং পকেট থেকে একটা পেঙ্গুইন সিরিজের ডিটেকটিভ বই বার করে সিগারেট ধরিয়ে পিছনে ঠেস দিয়ে পড়তে বসলুম।

খুব গোলমালের মধ্যেও আমি যে-বই মন দিয়ে পড়তে পারি তা হচ্ছে এই ডিটেকটিভ উপন্যাস। বিশেষ করে সেদিন যে-বইটি পড়ছিলুম সেটি লিখেছিলেন আমার অত্যন্ত প্রিয় বিলেতের একজন বিখ্যাত

লেখক। প্রথম তিন পাতার মধ্যেই উপন্যাস জমাবার কায়দা তিনি জানেন এবং সে-ক'পাতা পড়বার পর কাছিমের কামড়ের মতো তাঁর বই পেয়ে বসলো, ছাড়া যায় না। আমার মনের মধ্যে যে-সব বিচ্ছিন্ন ভাবনা ছিলো, প্রথম কয়েকপাতা পড়বার পর একে একে কোথায় যেন তারা অদৃশ্য হোলো আর আমি যে-জগতে এসে পৌঁছলুম সেখানে শুধু মৃত এক কোটিপতি যার মৃত্যু নিশ্চিত কোনো জটিল হত্যারহস্যে আবৃত; তাকে হত্যা করতে পারে তার এক নিকট বন্ধু কিংবা স্ত্রী কিংবা মেয়ে কিংবা তার ভাবী জামাই। অথচ বর্তমানে কাউকেই সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে আমার প্রিয় ডিটেকটিভ আবির্ভূত হয়েছেন। মাঝে-মাঝে সে পাইপে কড়া তামাক টানছে, আর ক্বচিৎ আপাতদৃষ্টিতে নিরর্থক মৃদু হাসছে কিংবা একটা পোড়া দেশলাই-এর কাঠি ও পাপোষের ওপরকার শুকনো একটু কাদা সযত্নে সিল্কের রুমালে জড়িয়ে সবাইকার অলক্ষিতে বুকপকেটে রাখছে। জানি আমার প্রিয় ডিটেকটিভের ভুল কখনো হয় না এবং শেষ পাতায় এই কাদা আর পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি দিয়েই নিশ্চিতভাবে তিনি অপরাধীকে ধরবেন এবং আশ্চর্য বিশ্লেষণশক্তি দিয়ে অপরাধ প্রমাণ করবেন।

ইত্যিমধ্যে সময় অনেকটা এগিয়ে গেছে। কয়েকজন আমার কামরাতেই যেন উঠলো। আবছা-আবছা তাদের ছায়া আমি অনুভব করছি। কিন্তু মুখ তুলে দেখবার প্রয়োজন বোধ করিনি। যখন মুখ তুললুম তখন দিল্লিযাত্রী এঞ্জিন ট্রেনে ধাক্কা দিয়েছে। চোখ তুলে দেখলুম প্ল্যাটফর্মের জনতা এখন চঞ্চল, ঘড়িতে ট্রেন ছাড়তে সাত মিনিট মাত্র বাকি এবং কালো পোশাক পরা গার্ড লাল-নীল ফ্ল্যাগ নিয়ে দ্রুতপায়ে ইঞ্জিনের দিকে এগিয়ে চলেছে। তখন শীতকাল। গোধূলি শেষ হয়ে প্রায় অন্ধকার।

আমার কামরার মধ্যে দেখি তিনজন লোক ইতিমধ্যে উঠে মাঝের ও ও-পাশের বেঞ্চিতে বসেছেন। একজন বিছানা পাতছিলেন,

একজন খবরের কাগজ পড়ছিলেন আর একজন দরজার রেলিঙ ধরে চা-ওলাকে ডাকছিলেন। আমি আবার বইতে মন দিলুম এবং বই থেকে চোখ যখন তুললুম তখন গাড়ি দুলে উঠেছে, গার্ড বাঁশি বাজিয়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কালো স্যুটপরা এক ভদ্রলোক দরজার হাতল ঘুরিয়ে আমাদের কামরাতেই উঠলেন। সঙ্গে জিনিসপত্র কিছুই নেই। মনে হোলো কাছাকাছি কোথাও যাবেন।

ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে যাবার পর আবার আমি বইতে মন দিলুম। মিনিট পাঁচেকও পড়িনি, হঠাৎ গম্ভীর গলার স্বরে চমকে উঠলুম এবং বই থেকে চোখ নামিয়ে চাইলুম। দেখলুম সেই দীর্ঘকায় কালো স্যুটপরা ভদ্রলোকটি তখনো বসেন নি, কামরার দেয়ালে ঠেস দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের সবাইকার মুখের দিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন। আমাকে চাইতে দেখে আবার তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'ছাখো গোবর্ধন, ওরফে সামসুদ্দিন, আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা কোরো না। আজ তুমি হাতে-হাতে ধরা পড়েছো। ছদ্মবেশ ছেড়ে বেরিয়ে এসো।'

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। অন্য তিনজন যাত্রীও আমারি মতো সমান অবাক হয়ে তাঁর দিকে চাইলো।

আমাদের কাউকে কোনো উত্তর দিতে না দেখে ভদ্রলোক তাঁর মাথার ওপরকার হ্যাট-র্যাকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, এই অ্যাটাচি কেসটা কার?'

আমরা চারজনেই একসঙ্গে চেয়ে দেখলুম, সেখানে একটি কালো রঙের ছোটো অ্যাটাচি-কেস রয়েছে, তার ওপর শাদা অক্ষরে লেখা। সেটা আমার নয়। অন্য তিনজনের মুখ দেখে মনে হোলো তাঁদেরও নয়।

এতোক্ষণ আমরা কেউ কোনো কথা বলি নি, সবাই অত্যন্ত

বিস্মিত হয়েছিলুম। ব্যাপারটা যে ঠিক কী কেউই বুঝতে পারি নি। কিন্তু এবার ওপাশের বেঞ্চিতে যে-ভদ্রলোক বিছানা পাতছিলেন তিনি কথা বললেন। ভদ্রলোককে ভালো করে এই প্রথম দেখলুম। বয়েস চল্লিশের বেশি নয়। মাড়োয়ারীদের মতো কাপড় পরা, গায়ে কালো পার্শী কোট, মাথায় কালো টুপি, চোখে রিমলেস চশমা। বেশ চালাক বলে মনে হয়। পরিষ্কার বাংলায় তিনি বললেন, 'মশাই, আপনি কী বলছেন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় এই তিনজন ভদ্রলোকের অবস্থাও আমারই সমান। আপনি যা বলছেন স্পষ্ট করে বলুন।'

স্যুট-পরা ভদ্রলোক বললেন, 'ভালো কথা। আমি স্পষ্ট করেই বলছি। আমি যা বলছি তা আপনাদের চারজনের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। অবশ্য কে যে বুঝতে পেরেছেন এখনো আমি সে-কথা ভালো করে বুঝতে পারছি না—যাই হোক, বাকি তিনজনের জন্যে আমি সব কথা বলছি।' এই বলে ভদ্রলোক অ্যাটাচি কেসটা উপর থেকে নামিয়ে বললেন, 'প্রথমে আবার জিগ্‌গেস করছি, এটি কার?'

আমরা চারজনে বললুম, আমাদের কারুরই নয়। স্যুটপরা ভদ্রলোক বললেন, 'ভালো কথা। এটি যে আমারও নয় সে-কথা স্পষ্ট করে প্রমাণ করতে পারি। কিন্তু এটি তো আর কামরার মধ্যে উড়ে আসতে পারে না। নিশ্চয়ই কেউ এনেছে। এখন কথা হচ্ছে, কে এনেছে?' বলেই আমাদের চারজনের মুখের দিকে ভদ্রলোক আবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন।

পার্শী কোটপরা ভদ্রলোকটি এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মশাই, হেঁয়ালি রাখুন। অ্যাটাচি কেসটি কে এনেছে তা জানা যাচ্ছে না, সত্যি। কিন্তু তাতে কী এসে গেলো?'

স্যুটপরা ভদ্রলোক বললেন, 'অনেক এসে গেলো মশাই! পাঁচশো টাকা এসে গেলো! এই যে অ্যাটাচি কেস দেখছেন এতে

লেখা রয়েছে I. B. অর্থাৎ India Bank আজ দুপুর বারোটায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ওই টাকা আনিয়ে রেখেছিলেন, পঞ্চাশটা দশটাকার নোট। কিন্তু ঠিক সাড়ে বারোটার সময় কলকাতার বিখ্যাত গুণ্ডা গোবর্ধন ওরফে শ্যামসুদ্দিন সেই ব্যাঙ্কে একা এসে হঠাৎ রিভলভার দেখিয়ে অ্যাটাচি কেসটা নিয়ে পাড়ি দেয়। আমরা খবর পাই একটার সময়…'

মাঝের বেঞ্চিতে আধ-বুড়ো এক ভদ্রলোক তুলোর আলোয়ান মাথায় মুড়ি দিয়ে বসে ছিলেন। তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনারা কারা? অর্থাৎ আপনি কে?'

স্যুটপরা ভদ্রলোক বললেন, 'নিশ্চয়ই সে-কথা জিগ্‌গেস করতে পারেন। আমি একজন সরকারের ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টের লোক। আমার নাম রঘুনাথ দাস।'

'অর্থাৎ ডিটেকটিভ?'

'হ্যাঁ, ডিটেকটিভ।'

গুজরাটি ভদ্রলোক বললেন, 'প্রমাণ?'

'এই যে,' বলে রঘুনাথ বুক-পকেট থেকে একটা খাম বার করে দিলেন। গুজরাটি ভদ্রলোক খাম থেকে কাগজগুলো বার করে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, 'হুঁ। কাগজ থেকে তাই প্রমাণ হচ্ছে।'

রঘুনাথ কাগজগুলো ফিরিয়ে নিয়ে খুশি হয়ে বললেন, 'আমার ওপর এই তদন্তের ভার এসে পড়ে। নানা কারণে গোবর্ধনকে আমি সন্দেহ করি। এবং তার পিছু নিই। সে-সব দীর্ঘ কাহিনী। কোর্টে পুরো গল্পটা শুনতে পাবেন। গোবর্ধনকে ফলো করে আমি ইস্টিশান পর্যন্ত আসি। লোকটা বেজায় চালাক—হ্যাঁ, তোমার সামনেই তোমাকে চালাক বলছি গোবর্ধন,' বলেই রঘুনাথ আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবাইকার মুখের দিকে চাইলেন। কিন্তু কারুর মুখেই বিস্ময় ছাড়া অন্য কোনো চমক দেখতে পাওয়া গেলো না যাতে অপরাধী সনাক্ত হতে পারে। তাই রঘুনাথ আবার বলে চললেন, 'গোবর্ধন বুঝতে পেরেছিলো তাকে ফলো করা হচ্ছে। তাই

ইস্টিশানে ঢুকেই আবার কোনদিক দিয়ে সে বেরিয়ে যায়। ছদ্মবেশ ধরতে লোকটা বেজায় পটু। চক্ষের নিমেষে তুমি নিজের চেহারা বদল করে ফেলতে পারো। কিন্তু এ-বারে তুমি একটা মুসকিলে পড়েছিলে গোবর্ধন। এই অ্যাটাচি-কেসটাই ধরিয়ে দিলো। এর চেহারা তুমি পালটাতে পারলে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো তুমি আজকের গাড়িতেই দিল্লি পালাবে। এবং আমার ভরসা ছিলো তুমি অ্যাটাচি-কেসটাকে তাড়াতাড়ি কোথাও সরাতে পারবে না। তুমি পালাবার পর আমি ট্রেনের প্রত্যেক কামরায় উঠে সবাইকার মালপত্র পরীক্ষা করে এসেছি। শুধু এই কামরাটাই বাকি ছিলো। এটাতে উঠেই দেখলুম চোখের সামনে রয়েছে এই অ্যাটাচি কেসটা। —তাই তুমি ধরা পড়ে গেলে গোবর্ধন।'

সেই বুড়ো ভদ্রলোকটির পাশে মাথায় লাল ফেজ পরা এক মুসলমান ভদ্রলোক বসে ছিলেন। এতক্ষণ তিনি অবাক হয়ে এইসব কথাবার্তা শুনছিলেন। এইবার তিনি প্রথম কথা বললেন, 'মিঃ দাস, এই অ্যাটাচি-কেসটাকে উপলক্ষ করে আপনি আমাদের চারজনের একজনকে আসামী বলে মনে করছেন। কিন্তু তার আগে কি উচিত নয় এটা খুলে পরীক্ষা করে দেখা যে এর মধ্যে সত্যিই পঞ্চাশটা দশ টাকার নোট আছে কি না? নোট যদি না থাকে তাহলে তো আপনার চার্জ প্রমাণ করবার কোনো উপায় নেই। ট্রেনে এ-রকম কত জিনিস পাওয়া যায় যার মালিক খুঁজে পাওয়া যায় না।'

সত্যিই তো! এই সোজা কথাটা এতক্ষণ কেন আমাদের মাথায় আসেনি! রঘুনাথ একটু যেন বিচলিত হয়ে পড়লেন, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ঠিক কথা বলেছেন। গোবর্ধন অতিশয় শয়তান। হয়তো সে নোটগুলো সরিয়েছে ইতিমধ্যে। দেখাই যাক কী আছে।'

আমরা চারজনে উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলুম। রঘুনাথ সবাইকার সামনে অ্যাটাচি কেসটা খুলে ফেললেন। আর সবাই আমরা স্পষ্ট

দেখলুম তার মধ্যে রয়েছে পাঁচ বাণ্ডিল দশ টাকার নোট। রঘুনাথ গুনে দেখলেন প্রত্যেক বাণ্ডিলেই দশটা করে নোট রয়েছে।

এবারে রঘুনাথের মুখ যে-পরিমাণ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আমাদের চারজনের মুখ সেই পরিমাণে যেন নিভে গেলো। অ্যাটাচি কেসটা ভালো করে বন্ধ করে তিনি বললেন, 'দেখলে গোবর্ধন! আমি জানি এখন টাকার তোমার ভীষণ দরকার। অনেকদিন পুলিশ তোমার পিছু নিয়েছে সে খবর তুমি জানো, তাই একটা বড়-রকম দাঁও মেরে কলকাতা থেকে গা-ঢাকা দেবার মৎলবে তুমি ছিলে। কিন্তু অল্পের জন্য পারলে না।—আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। অনর্থক তুমি ক'জনকে হায়রান করছো কেন? তোমার জন্য আর তিনজন ভদ্রলোককেও আমার সঙ্গে বর্ধমান পুলিশ-স্টেশনে যেতে হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না বাকি তিনজনকে নির্ভুলভাবে সনাক্ত করা যায় ততক্ষণ আটক থাকতে হবে।'

এই কথা শুনেই তো আমার চক্ষু চড়কগাছ! আমি প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'অ্যাবসার্ড মশাই! পরশুই দিল্লিতে আমার নতুন চাকরির জয়েনিং ডেট। কাল রাতের মধ্যে আমাকে পৌঁছুতে হবেই। লেটার অব অ্যাপয়েন্টমেণ্ট সঙ্গেই আছে। দেখাচ্ছি। তাহলে তো ছেড়ে দেবেন?'

রঘুনাথ বললেন, 'অসম্ভব। কোনো উপায় নেই মশাই আপনাকে ছেড়ে দেবার। গোবর্ধন দারুণ জালিয়াত। সে যে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার জাল করতে পারবে না তাই বা কে বলতে পারে?'

গুজরাটি ভদ্রলোক এবারে বেশ উত্তেজিত হয়েই বললেন, 'আমাকেও আপনার জুলুমে নামতে হবে নাকি, মশাই? জানেন কলকাতা বোম্বাই আর দিল্লিতে আমার কত বড় কারবার আছে? কোটি কোটি টাকা খাটছে। পরশু দিল্লিতে আমারও একটা জরুরি কনফারেন্স আছে। আমার নাম মিঃ মিরানি। জুটের বাজারে আমাকে চেনে না এমন লোক খুব কম আছে।'

মুসলমান ভদ্রলোকটি সসম্ভ্রমে-বলে উঠলেন, 'আপনিই মিঃ মিরানি। কী আশ্চর্য ব্যাপার!'

'দেখলেন তো?' সগর্বে মিরানি বললেন, 'এই দেখুন, এই কামরাতেই আমাকে চেনেন এমন এক ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।'

রঘুনাথ বললেন, 'কিছুই প্রমাণ হোলো না মশাই! ক্ষমা করবেন, কিন্তু কে বলতে পারে আপনি গোবর্ধন নন এবং ইনি আপনার সাকরেদ নন? চটবেন না। মিঃ মিরানি যে একজন বিখ্যাত বিজনেসম্যান সে খবর আমিও জানি। কিন্তু যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে আপনিই আসল মিঃ মিরানি ততক্ষণ আপনাকে ছেড়ে দিতে পারবো না।'

মুসলমান ভদ্রলোকটি বললো, 'কী বিপদেই পড়েছি মশাই! আমিও একজন বিজনেসম্যান। কলকাতার নানা জায়গায় আমার ছোটবড় মনিহারি দোকান আছে। তা ছাড়া মাল চালানও আমি করে থাকি। এই দেখুন আজ তার পেয়েছি কানপুর থেকে : আমার মেয়ের প্রায় শেষ অবস্থা। টাইফয়েডে ভুগছে। ডাক্তার একরকম জবাব দিয়ে গিয়েছে। যদি কাল না পৌছুই তাহলে হয়তো শেষ দেখা দেখতে পাবো না।' শেষের দিকে ভদ্রলোকের গলা ভেঙে এলো। তিনি টেলিগ্রামটা পকেট থেকে বার করে রঘুনাথের হাতে দিলেন কিন্তু তিনি সেটা পড়েই ফেরৎ দিয়ে বললেন, 'দেখুন মিঃ আহ্‌মেদ, আপনার জন্য আমার সত্যিই খুব দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ না পুলিশের লোক আপনাকে আসল মিঃ আহ্‌মেদ বলে সনাক্ত করছে ততকণ আপনাকে আটকে রাখতে আমি বাধ্য।'

আধ-বুড়ো ভদ্রলোকটি বললেন, 'কার মুখ দেখে যে তীর্থ করতে বেরিয়েছিলুম তা বাবা বিশ্বনাথই জানেন! ভাবলুম একবার কাশী ঘুরে দশাশ্বমেধ ঘাটে একটা ডুব দিয়ে আসি। কোনদিন আছি কোনদিন নেই—তা, গোড়াতেই এই বিপদ। কত পাপই যে

করেছি কে জানে!' এই বলে তিনি বেঞ্চির এক কোনে ঠেস দিয়ে ঢুলতে লাগলেন।

মিরানি খানিক পরে বললেন, 'ভালো কথা, এই কামরায় প্রথম কে ঢুকেছিলেন?'

সভয়ে আমি বললুম, 'কেন বলুন তো? আমিই ঢুকেছিলুম।'

'আপনি কি ঐ অ্যাটাচি কেসটা দেখেছিলেন?'

সত্যি কথা বলতে কি, আমি খুব খুঁটিয়ে দেখিনি, ঠিক মনেও পড়লো না দেখেছিলুম কি না। বললুম, 'ঠিক তো মনে পড়ছে না। তবে যতদূর সম্ভব মনে হচ্ছে কিছুই দেখিনি।'

রঘুনাথ একটু বাঁকা হেসে বললেন, 'যতদূর সম্ভব?' তারপর তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। আহ্‌মেদ ও মিরানি আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। আধবুড়ো ভদ্রলোকটিও ঢুলতে-ঢুলতে একবার চোখ বড় করে আমার দিকে চেয়ে আবার ঢুলতে লাগলেন। আমারও ভীষণ অশান্তি হতে লাগলো। কে জানতো একদিন লোকে আমাকে গোবর্ধন বলে ভুল করবে! কোনো কথা ঠোঁটে জোগালো না। নতুন চাকরি আর নতুন দেশ দেখতে যাবার আনন্দ অনেকক্ষণ উবে গেছে! এবারে একটা অবর্ণনীয় অস্বস্তিতে ভেতরে ঘেমে উঠতে লাগলুম। পুলিসের অসাধ্য কিছু নেই। কে জানে বিচারে হয়তো আমাকেই আসল গোবর্ধন বলে প্রমাণ করে ছাড়বে! অন্য উপায় না দেখে আমিও একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরের কালো হিম রাত্রির দিকে চেয়ে রইলুম।

তুফান মেল হাওড়া থেকে এক দৌড়ে বর্ধমান গিয়ে থামে। প্রায় ২ ঘণ্টা লাগে। ঘড়ি দেখলুম বর্ধমান পৌঁছুতে এখনো প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট বাকি। এমন সময় মিরানি হঠাৎ বললেন, 'ঠিক হয়েছে মিঃ দাস। কতো টাকা জামিন দিতে পারলে আমাকে ছেড়ে দিতে পারেন? কাল আমাকে যেমন করেই হোক দিল্লি পৌঁছুতেই হবে।'

'জামিন?' রঘুনাথ খানিক ভেবে বললেন, 'বেশ; জামিনে

আপনাকে ছাড়তে রাজি আছি। কিন্তু এই অ্যাটাচি কেসে যত টাকা আছে তত টাকা জামিন দিতে না পারলে আপনাকে বর্ধমানে নামতেই হবে। পাঁচশো টাকা জামিন। কিন্তু চেকে দিলে চলবে না। নগদ দিতে হবে।' তারপর একটু হেসে বললেন, 'নগদ পাঁচশো দিতে পারবেন আশা করি!' (অর্থাৎ আপনার কাছে নিশ্চয়ই নগদ পাঁচশো টাকা নেই, এবং আপনাকে নামতে হবে বর্ধমান।)

এইবার মিরানি হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, 'মিঃ দাস! আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা খুব উঁচু বলে মনে হচ্ছে না! কিন্তু যাই হোক, আপনাকে এবারে কিন্তু হতাশ হতেই হবে।' এই বলে তিনি তাঁর পার্শি কোটের ভিতর থেকে একটা বড় মানিব্যাগ বার করে খুললেন। সবিস্ময়ে দেখলুম, সেটার আকণ্ঠ নোটে ঠাসা।

মিরানি বললেন, 'আমার কাছে উপস্থিত মাত্র বারোশো টাকা ও কয়েকটা গিনি আছে। আপনি পাঁচশো টাকার একটা রসিদ লিখে দিন। আপনাকে পঞ্চাশটা দশ টাকার নোট গুনে দিচ্ছি।' এই বলে আমাদের সামনে তিনি পঞ্চাশটা দশ টাকার নোট গুনে রঘুনাথের হাতে দিলেন। রঘুনাথ খানিকটা লজ্জিত খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পকেট থেকে রসিদ বই বার করে ঘাড় হেঁট করে একটা রসিদ লিখে দিলেন। মিরানি রসিদটা ভালো করে পরীক্ষা করে মানিব্যাগে পুরে সবাইকার দিকে বিজয়ী ভঙ্গীতে চেয়ে বেশ প্রাণ খুলেই হাসলেন। রঘুনাথ দাসকে অপ্রস্তুত হতে দেখে মনে-মনে বেশ খুসি হয়ে উঠলুম।

মিরানির নিশ্চয়ই রোখ চেপে গিয়েছিলো। খানিক পরে তিনি আমার ও আহ্‌মেদের দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখুন, এইভাবে একা পুলিশের হাত এড়িয়ে দিল্লি যেতে নিজেকে খুব স্বার্থপর বলে নিজের কাছে মনে হচ্ছে। আমার কাছে এখনো যে টাকা আছে তাতে আপনাদের তিনজনের একজনের জামিনের টাকা দিতে পারি। যাঁর টাকা দেবো তিনি আমাকে একটা পাঁচশো টাকার চেক লিখে দিলেই

চলবে। আমি মশাই বিজনেসম্যান, সানন্দেই আপনাদের চেক নেবো। এইখানেই আমার সঙ্গে পুলিসের কিছুটা তফাৎ আছে— কী বলেন মিঃ দাস?' মিঃ দাস অপমানিত বোধ করে জানলার বাইরে চেয়ে রইলেন, কথাটি বললেন না। মিরানি আবার বলে চললেন, 'কিন্তু তার আগে আমি আপনাদের সঙ্গে যে পরিচয়পত্র আছে সেগুলো ভালো করে পরীক্ষা করতে চাই এবং যাঁর পরিচয় আমার কাছে বেশি কনভিনসিং বলে মনে হবে তাঁর জামিনের টাকাই দেবো।'

তাঁর কথা শুনে আমি ও আহ্‌মেদ খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। কিন্তু আধবুড়ো তীর্থযাত্রীটি খুব উৎসাহ প্রকাশ না করে বললেন, 'আমার কাছে তো নিজের পরিচয় দেবার কোনো কাগজপত্র নেই। তা ছাড়া ব্যাঙ্কে আমার পাঁচশো টাকাই নেই তো পাঁচশো টাকার চেক! নাঃ মশাই, দেখছি, বাবা বিশ্বনাথের ইচ্ছে বর্ধমানে আমাকে এক রাত আটকে রাখেন। তাই-ই হবে।'

বুড়োর দিকে আমরা ক-জন এবার বেশ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাইলুম। কিন্তু তিনি বেশ নির্বিকার চিত্তে তাঁর আলোয়ানটা মুড়ে গুটিশুটি হয়ে ঢুলতে লাগলেন। আমি নিজের কয়েকটি পরিচয়-পত্র এবং আপিসের চিঠি মিরানিকে দিলুম। আহ্‌মেদ দিলেন কানপুর থেকে আসা টেলিগ্রাম ও আরো কয়েকটি চিঠিপত্র। মিনিট পাঁচেক খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করে কাগজগুলি আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মিরানি বললেন, 'মুস্কিলে পড়া গেলো তো মশাই! আপনাদের দুজনকেই আমার সমান সঠিক লোক বলে মনে হচ্ছে। আমার উচিত আপনাদের দুজনকেই জামিনের টাকা দেয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এবারে বেশি টাকা সঙ্গে নেই। আপনাদের একজন কাউকে আমি টাকা দিতে পারি। কিন্তু কাকে দিই?' তারপর একটু থেমে তিনি বললেন, 'এক কাজ করা যেতে পারে। আমি পকেট থেকে টাকা বের করে বেঞ্চিতে রাখবো। মিঃ আহ্‌মেদ, আপনি বলুন হেড না টেল

কী হবে। যদি ঠিক বলতে পারেন তাহলে টাকা আপনি পাবেন। নইলে টাকা এই ভদ্রলোককে দেবো।'

আহ্মেদ একটু ভেবে বললেন, 'টেল।' মিরানি টাকা বের করে বেঞ্চিতে রাখলেন। দেখলুম হেড।

'সরি মিঃ আহ্মেদ', মিরানি বললেন, 'আপনাকে দিতে পারলুম না।—মিঃ দাস, কষ্ট করে আর-একটা পাঁচশো টাকার রসিদ লিখে দিন।'

রঘুনাথ নিঃশব্দে আর একটি রসিদ লিখতে লাগলেন। চেক বই বার করে মিরানিকে আমি পাঁচশো টাকার একটি চেক লিখে দিলুম।

আহ্মেদ 'সবই আল্লার ইচ্ছে' বলে ছল-ছল চোখে জানলার বাইরে চেয়ে রইলেন। আর সেই আধবুড়ো ভদ্রলোক ঢুলতে ঢুলতে আর-একবার চোখ বড়-বড় করে আমার দিকে চেয়ে আবার ঢুলতে লাগলেন। মিনিট কয়েক পরে বর্ধমান ইস্টিশান এলো। অ্যাটাচি-কেস হাতে এবং আহ্মেদ ও সেই আধবুড়া তীর্থযাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নেমে যাবার সময় রঘুনাথ বললেন, 'আশা করি সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আপনার টাকাগুলো সরকারের কাছ থেকে ফেরৎ পাবেন।'

তাঁরা নেমে গেলে মিরানি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'যাই বলুন মশাই, আমার কিন্তু ওই বুড়োকে খুব সুবিধের মনে হোলো না।'

আমিও সায় দিয়ে বললুম, 'আমারো কি রকম যেন লাগলো।'

* * *

দিন-দশেক পরে নতুন দিল্লির কফি হাউসে আমার এক কলকাতার বন্ধুর সঙ্গে দেখা।

খুসি হয়ে তার পাশে বসে বললুম, 'কী ব্যাপার হে? কবে এলে?'

'কাল এসেছি, ভাই। একটা ইণ্টারভিউ দিতে আসতে হয়েছে। ঘোড়ার ডিমের চাকরি তো হয় না কেবল ইণ্টারভিউ দিচ্ছি।' পরের মুহূর্তেই কি যেন মনে পড়ায় তার চোখমুখ জ্বলজ্বল করে উঠলো।

বললো, 'জানো, পরশু ট্রেনে সে এক দারুণ ইন্টাররেস্টিং ব্যাপার। …কলকাতার এক বিখ্যাত জালিয়াত আর গুণ্ডা গোবর্ধন ছদ্মবেশে আমার কামরায় উঠেছিলো। এক ডিটেকটিভ তাকে ফলো করে আমাদের কামরায় ওঠে। আমাদের চারজনকেই সে সন্দেহ করে ‥'

অবাক হয়ে বললুম, 'চারজন ? মানে ?'

'আমি, এক আধবুড়ো তীর্থযাত্রী, এক মুসলমান ভদ্রলোক ও মিঃ মিরানি। মিঃ মিরানিকে চেনো না, কলকাতার বিখ্যাত বিজনেস ম্যাগনেট ? ভাগ্যিস তিনি ছিলেন, তাই আমার জামিনের পাঁচশো টাকা তিনি অ্যাডভান্স করলেন। নইলে পুলিশের পাল্লায় বর্ধমানে আটকাই পড়ে গিয়েছিলুম।'

আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো। নিশ্চয়ই মুখের রঙও বদলে গিয়েছিলো। তাই বন্ধু আমার মুখের দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে বললো, 'ওকি ? কী হোলো তোমার ?'

'না, বিশেষ কিছু নয়।' চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললুম, 'বেয়ারাকে আরো দু' কাপ হট-কফি দিতে বল। গল্পের শেষটা বলছি। শুনে খুব খুসি হবে না।'

॥ লণ্ডনে প্রথম দিন ॥

জুরিখ থেকে জেনিভা ট্রেনে। জেনিভা থেকে লণ্ডনে সুইস প্লেনে যখন নামলো, তখন বিকেল—আমাদের দেশি ভাষায় বিকেল না বললেও গোধূলি-লগ্ন বলা যায়। প্লেন থেকে দিগন্তের সীমারেখার অনেক উপরে সূর্যকে দেখছিলাম। লণ্ডনের উপর চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে প্লেন যত নামতে লাগলো, দেখতে-দেখতে তরতর করে সূর্যও তত নামতে লাগলো। অবশেষে সূর্য চক্রবাল স্পর্শ করলো। আমরাও লণ্ডনের উপকণ্ঠে নর্থোল্ট এয়ার-পোর্টে নামলাম।

নামলাম—এই কথাটা লিখতে, বলতে এবং শুনতে সহজ হলেও আমার পক্ষে সেদিন বেশ কঠিনই হয়েছিলো। তোমরা ভাবছো, 'নামলাম' মানে তো নেমে এলাম—অর্থাৎ আমরা এখানে যে-রকম বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি বা ট্রেন থেকে নেমে আসি, সেই রকমই বুঝি নেমে আসা। অন্যান্য ভাগ্যবান প্লেনযাত্রীদের পক্ষে হয়তো নেমে আসাটা ঐ রকমই সহজ হয়েছিলো, কিন্তু আমার কাছে মোটেই তা হয়নি। নামলাম মানে আমরা নামলাম—অর্থাৎ আমি আমার স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে নামলাম। আমার স্ত্রীর শরীর দুর্বল, তাই তাঁর পক্ষে কোনো কিছু বহন করা সম্ভব নয় এবং আমার কন্যা মানুষটি ছোট্ট হলেও মেজাজটি ভারিক্কি—চলতে-ফিরতে পারলেও তিনি বায়না ধরলেন কোলে চড়বেন। ফলে আমার দুই কাঁধে আমাদের তিন জনের তিনটি ওভারকোট ও তিনটি রেনকোট, আমার দুই হাতে আমাদের তিন-জনের তিনটি লাস্ট-মিনিট ব্যাগ, তাছাড়া ক্যামেরা ছাতা পাসপোর্ট ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত দলিল এবং সর্বোপরি আমার কোলে কন্যা। গন্ধমাদন বহন করে শূন্য থেকে সেই ত্রেতাযুগে শ্রীহনুমান যখন

নেমেছিলেন, মনে-মনে ভাবলাম, হয়তো আমার মতোই সেদিন তাঁকে দেখাচ্ছিলো।

লণ্ডন সম্বন্ধে বাল্যকালাবধি নানা কাহিনী শুনেছি, অনেক রকম আলোচনা করেছি, মাঝেমাঝে স্বপ্নও দেখেছি। 'সুইস প্লেন' নিতান্ত সহজভাবে মেঘ-রৌদ্র এবং বিকেলের স্বর্ণাভ মায়াজাল ছিন্ন করে যখন চক্রাকারে সেই লণ্ডনের উপর নামতে লাগলো এবং যখন প্লেনের মধ্যেকার লাল আলোর অক্ষর জ্বলে-জ্বলে উঠে নিঃশব্দে বলতে লাগলো 'নো স্মোকিং' এবং 'ফাসন্ ইওর বেল্টস্' (অর্থাৎ এখন আর ধূমপান নয়, চেয়ার-সংলগ্ন বেল্ট কষে আঁটো) তখন মানসিক উত্তেজনা দমন করবার জন্যই যেন শক্ত করে বেল্ট আঁটছিলাম। প্লেন থেকে নেমে পরিষ্কার আকাশ এবং আমাদেরই দেশের মতো সূর্যাস্ত দেখতে-দেখতে মনে হোলো : এই তাহলে লণ্ডন! সেই স্বপ্নে-দেখা আলোচনা-করা সাত হাজার মাইল দূরের দেশ! এখানকার কিছুই চেনা নয়, অথচ রোমাঞ্চকর নোতুনও নয়। ডুবন্ত সূর্যের রশ্মি, ঘাসের রঙ, মাঠের চেহারা—এদের বোধহয় জাত নেই। সব দেশেই সমান।

কাস্টম্‌সের বূ্যহ ভেদ করে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বাসে চড়ে যখন খোদ লণ্ডন শহরের মধ্যে উড়োজাহাজ কোম্পানির বড় আপিসে পৌঁছলাম, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। ক্ষিধেও পাচ্ছে, শীতও করছে। চারিদিকে ব্যস্ত লোকের ভিড়। কেউই লক্ষ্য করছে না যেন। অথচ হন্তদন্ত যে-কোনো মানুষকেই যা-কিছু প্রশ্ন করো না কেন, মুহূর্তের মধ্যে থেমে মন দিয়ে তোমার কথা শুনে মুস্কিল আসানের ব্যবস্থা যথাসাধ্য সে করবে। য়ুরোপের মানুষের নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যই প্রথম চোখে পড়লো। সবাই ব্যস্ত অথচ হল্লা নেই ; ভিড় প্রচুর অথচ ঠেলাঠেলি নেই। শেষে এসে কনুইয়ের গুঁতো মেরে এগিয়ে নিজের কাজ হাসিল করবার চেষ্টা নেই। যে-যার নিজের জায়গায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে।

দেখাদেখি আমরাও ভারতীয়রা ফিসফিসে গলায় লাইনে দাঁড়িয়ে

কথা বলছিলাম। কিন্তু বিপদ হোলো আমার কন্যাকে নিয়ে। তাকে যা শেখাবে, ঠিক তার উল্টোটি সে করবেই। বললাম, 'বুড্ঢা, চেঁচামেচি কোরো না। এখানকার লোকেরা নিন্দে করবে।'

সঙ্গে-সঙ্গে গলা দিয়ে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ কু-স্বর বার করে সে জবাব দিলো, 'কই বাবুম! কেউ তো নিন্দে করলো না!'

আমি সস্ত্রীক অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই উড়োজাহাজ কোম্পানির আপিসের জনতার সবাকার চোখে যেন চাপা বিদ্রূপের হাসি খেলতে লাগলো। এই জংলি বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে কী যে করবো, ভেবে পেলাম না।

আমার পালা যখন এলো, রসিদ দেখিয়ে মালপত্র ছাড়িয়ে নিয়ে পোর্টারকে ট্যাক্সি ডেকে দিতে বললাম। ট্যাক্সিতে উঠে হোটেলের ঠিকানা বলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

সুইৎজারল্যাণ্ড থেকে লণ্ডনে আসা আর চৌরঙ্গী থেকে বেহালায় যাওয়া একই কথা। সুইৎজারল্যাণ্ডের রাস্তাঘাট দোকানপাট হোটেল রেস্তরাঁ লোকজন বাসট্রাম ঝকঝক করছে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। কোনো জিনিসের অভাব নেই—'অভাব' বলে কথাটাই নেই সুইৎজারল্যাণ্ডের অভিধানে। পরপর দুটি মহাযুদ্ধে সমস্ত য়ুরোপ যখন প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে, সুইৎজারল্যাণ্ডের মানুষদের সমৃদ্ধি তখন শুধুই বেড়েছে। সমস্ত য়ুরোপে যখন নেই-নেই হায়-হায় রব, সমস্ত সুইৎজারল্যাণ্ড তখন সোনার পিঠে পর বসে দু'হাত দিয়ে আরো ঐশ্বর্য কুড়িয়েছে। এ-সব কথা আগে কাগজে পড়েছিলাম। আজ চোখে দেখলাম। কাগজে-পড়া এবং চোখে-দেখার মধ্যে যে কতটা তফাৎ, ইতিপূর্বে তা কল্পনাও করতে পারিনি।

লণ্ডনে আমরা যে-হোটেলে উঠলাম, নাম তার প্যালেস হোটেল। শুনেছিলাম, এই হোটেল জাতে উঁচু দিকের দ্বিতীয় শ্রেণীর। আমাদের আড়াই জনের জন্য দৈনিক সাড়ে চার পাউণ্ড ভাড়া। অর্থাৎ প্রায় ষাট টাকা। রাত্রে হোটেলে পৌঁছে প্রথমে বেশ হতাশই

হলাম। লিফটগুলো ভাঙা, কাঁপতে-কাঁপতে ওঠে; আসবাবপত্রে কোনো জৌলুস নেই, খাট-বিছানা নিতান্ত মামুলি ধাঁচের; খাওয়া-দাওয়া যতটুকু না হলে নয়—দুধের অত্যন্ত অভাব, চিনি নেই বললেই চলে। কড়া র‍্যাশনিং। এক কালে অবস্থা ভালো ছিলো, এখন পড়ে গেছে—হোটেলের লাউঞ্জ, ডাইনিং রুম, বেড-রুম, বাথ-রুম সর্বত্রই এই কথা যেন খোদাই করা।

রাত্রে ঠাণ্ডা বিছানায় শুয়ে এইসব কথাই ভাবছিলাম। লণ্ডনে নামবার আগে অকস্মাৎ যে-উত্তেজনা এসেছিলো, তার বদলে এখন অবসাদ নামছে। অনেকটা দমে গেছি। কাল কী করবো ভাবতে-ভাবতে আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়লো। বছরখানেক এখানে আছে। নোট বইতে তার ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর ছিলো। বিছানা ছেড়ে গ্যাসের আগুনে হাত সেঁকতে-সেঁকতে নোটবই হাতড়ে তার টেলিফোন নম্বর বার করলাম। টেলিফোনের রিসিভার তুলে তার খোঁজ করতে শুরু করলাম। রাত তখন সাড়ে দশটা।

বন্ধু ঠিকানা বদলেছে, খবর পেলাম। নতুন ঠিকানায় ফোন করে জানলাম, সেখানেও নেই। অন্য আর-এক ফোন নম্বর পেলাম। রাত প্রায় এগারোটায় বন্ধুকে ফোনে ধরলাম।

'হ্যালো! কামাক্ষী? বাই জোভ! কবে ল্যাণ্ড করলে? আজই? হোয়াট এ প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ!—আছো কোথায়? প্যালেস হোটেলে? বেশ, বেশ।—কী বললে, স্ত্রী আর বাচ্চাও এসেছে? মাই গুডনেস, একেবারে সপরিবারে? হোয়াই ডোণ্ট ইউ লাঞ্চ উইথ মি টু-মরো? ওয়ান পি, এম, শার্প। ইণ্ডিয়া হাউস।—চেনো না? চিনে বার করা মুস্কিল? নাউ, ডোণ্ট বি এ কিড! আমাকে যেতে হবে সকালে? অল রাইট অল রাইট। কাল সকাল দশটায় তোমার হোটেলে যাবো। গুড নাইট অ্যাণ্ড সুইট ড্রীমস—'

সুইট ড্রীমস আর হোলো না। ভাঙা-ভাঙা ঘুম, ভাঙা-ভাঙা স্বপ্ন, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বিছানা। তবুও রাত কাটলো। ভোর হোলো।

সকালে মুখ-হাত ধুয়ে চা-টা খেয়ে তৈরি হতে-হতে আটটা বাজলো। হোটেলের গোল জানলার ভিতর দিয়ে দু-চার বার উঁকিঝুঁকি মেরে লণ্ডন শহরটাকে দেখবার খানিক চেষ্টা করে বিফল হয়েছিলাম। খানিকটা গোল নীল আকাশ, মাঝে-মাঝে আমাদের দেশের শরৎ কালের মতো শাদা-শাদা মেঘ, কতকগুলো গাছের চুড়ো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি। তাই ভাবলাম, যতক্ষণ না বন্ধু আসে, ততক্ষণ একটু বাইরে বেরিয়ে পথ-ঘাট দেখে আসি।

চারতলার উপর আমাদের ঘর। লিফটের কাছে গিয়ে দেখি, আর-এক বৃদ্ধা ইংরেজ মহিলা অপেক্ষা করছেন। সুপ্রভাত জানালাম। ব্যাজার কণ্ঠে প্রতি-সুপ্রভাত তিনি জানালেন। তারপর দু'জনেই নির্বাক হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মিনিট পাঁচ-সাত অপেক্ষা করেও লিফট আসে না দেখে যখন ভাবছি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে অনেক আগে নিচের তলায় পৌঁছতাম, লিফটের তার তখন কেঁপে উঠলো এবং কাঁপা-কাঁপা শব্দ কানে এলো।

বৃদ্ধা আচমকা প্রশ্ন করলেন, আমি কোথা থেকে আসছি। ভারতবর্ষ শুনে আবার জানতে চাইলেন আমি ইতিপূর্বে লিফট দেখেছি কি না। মনে-মনে আমিও ব্যাজার হয়ে উঠেছিলাম। তাই বললাম, 'ঠিক এইরকম লিফট আগে দেখিনি যার জন্য ঘণ্টা টিপে দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়।' বৃদ্ধা বোধহয় এ-ধরনের উত্তর আশা করেননি। লিফটের খাঁচায় দু'জনে ঢুকে কোলাপসিবল দরজা বন্ধ করে নিচে নামবার বোতাম টিপলাম। প্রথমে লিফট একটু কেঁপে উঠে স্থির হয়ে রইলো। বার দুই-তিন চেষ্টা করার পর বৃদ্ধার মতোই যেন নিতান্ত ব্যাজার হয়ে থর-থর করে কাঁপতে-কাঁপতে এবং নানারকম শব্দ করতে-করতে ধীরে-ধীরে নিচে নামতে লাগলো।

বৃদ্ধা অকস্মাৎ প্রশ্ন করলেন, 'তুমি যীশুখ্রীস্টের নাম শুনেছো?'

'শুনেছি' বলায় তিনি বললেন, 'সেই যীশুখ্রীস্ট, ঈশ্বরের সন্তান, একদিন পৃথিবীতে এসেছিলেন আমাদের শক্তিতে-সামর্থ্যে বিদ্যায়-

বুদ্ধিতে, ধনে-দৌলতে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি করে তুলতে। তুমি আজ ইংলণ্ডের যে-চেহারা দেখছো, এ তার আসল রূপ নয়। আমাদের বাড়ি-ঘর লিফট-ফার্নিচার দোকান-পাট জামা-কাপড় সমস্তই একদিন ঝকঝকে তকতকে ছিলো।—যীশুখ্রীস্ট আবার শীঘ্রই আসবেন আবার ইংরেজকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসনে বসবার জন্য। সে-দিন আর দূরে নয়, সে-দিনের আর দেরি নেই—' বলতে-বলতে ভদ্রমহিলার পুরনো শুকনো আপেলের মতো গালগুলো টকটকে লাল হয়ে উঠলো, উত্তেজনায় এই পুরনো লিফটের চেয়েও তিনি বেশি থরথর করতে লাগলেন। যীশুখ্রীস্ট স্বর্গ থেকে বৃদ্ধার এই কথা শুনে কী ভাবলেন ভেবে আমার কান লাল হয়ে উঠলো। লিফট এসে ঝকাং করে থামলো একতলায়। হোটেলের অন্ধকার গলিপথ পেরিয়ে বাইরে পরিষ্কার আলো আর নীল আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একমুখ হেসে বৃদ্ধা আমাকে বললেন, 'ইজ্‌ন্ট ইট এ লাভলি ডে ?' তারপর বিদায় নিলেন।

যে-রাস্তার উপর এই হোটেল তার নাম বেজওয়াটার রোড। রাস্তার উল্টো দিকে কেনসিংটন গার্ডনস। বিরাট পার্ক। কেনসিংটন গার্ডনস-এর সঙ্গে লাগোয়া লণ্ডনের বিখ্যাত হাইড পার্ক। এখন হেমন্তকাল। বিরাট গাছগুলোর পাতা তামাটে হয়ে ঝরে-ঝরে পড়ছে। রাশি-রাশি শুকনো পাতা জমেছে গাছের তলায়। খানিক ঘুরে বেড়ালাম, তারপর খালি দেখে একটা বেঞ্চিতে বসলাম। লণ্ডনে সিগারেট পাওয়া এক দায়। আগেই শুনেছিলাম। তাই সুইৎজারল্যাণ্ড থেকে কিছু সিগারেট সঙ্গে এনেছিলাম। সন্তর্পণে একটি সিগারেট ধরিয়ে চারিদিক দেখতে লাগলাম।

আসলে অবাক হবার মতো কিছুই নেই। বড়-বড় বাড়ি, লণ্ডনের ধোঁয়া আর ঝুলে কালো-কালো চেহারা ; সামনে রাস্তা সারানো হচ্ছে, নানা মজুর খাটছে। ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা কাপড়-জামা পরনে। রাস্তা দিয়ে যারা চলেছে, তারা প্রায় সবাই সায়েব-মেম বটে, কিন্তু কাপড়-

জামা পোশাক-আশাকের পারিপাট্য প্রায় চোখেই পড়ে না। বিবর্ণ কোটের আস্তিনে চামড়ার তাপ্পি, ছাই-রঙা ট্রাউজারের ছিরি-ছাঁদ নেই—হামেশাই চোখে পড়ে। নিজের পুরনো জামা-কাপড় সম্বন্ধে আশঙ্কা ছিলো—এদের দেখে আশ্বস্ত হলাম।

সবাই ব্যস্ত—এই ব্যস্ততার ভাবটাই আমাদের চোখে নোতুন লাগে। কলকাতার পার্কগুলোর কথা একবার ভাবো। এমন পার্ক কি কলকাতার কোথাও কোনো সময়ে কেউ দেখেছো, যেখানে বেঞ্চিতে বা মাটিতে গামছা পেতে কেউ-না-কেউ ঘুমোচ্ছে না? এখানে ঘুমন্ত-ঝিমন্ত লোকের অত্যন্ত অভাব। সবাই অতিমাত্রায় জাগ্রত! সবাই ব্যস্ত। গত মহাযুদ্ধের দেনা শোধবার জন্য সমস্ত জাতটা এক জোটে যেন উঠে-পড়ে লেগেছে।

বসে আছি আর সিগারেট টানছি আর দেখছি। নানা কথা ভাবছিও। মনে-মনে খুব অবাক হবার চেষ্টা করছি এই কথা ভেবে যে, আজ আমি আমার কৈশোরের কল্পলোকের হৃদপিণ্ডে সশরীরে বসে আছি। ভারতবর্ষ থেকে সাত হাজার মাইল দূরে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে ইংলণ্ডে পৌঁছেছি ভেবে রোমাঞ্চিত হবার জন্যও ঘন-ঘন চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। 'বিলেতের দেশটা মাটির সেটা' কবিতাটি মনে-মনে আওড়াচ্ছি। ঘন-ঘন সিগারেট টানছি। এমন সময় দুই প্রৌঢ়া মহিলার আলোচনার কাটা-কাটা কথা কানে এলো। আমার পাশ দিয়ে যেতে-যেতে একজন আর-একজনকে প্রশ্ন করলেন, 'ইজ হি ফ্রম ইণ্ডিয়া?'

উত্তরে তার সঙ্গিনী বললেন, 'ও! আই থিঙ্ক হি ইজ ফ্রম পাকিস্টান।'

এই আলোচনায় আমার কি-রকম যেন বিষম লাগবার উপক্রম হোলো। আমার রঙ দেখে না হয় ভারতীয় চেনা সোজা। কিন্তু আমার কী জৌলুস আছে যাতে পাকিস্তানী বলে সন্দেহ হতে পারে? আমরা তো নিজেরাই চিনতে পারি না কে ভারতীয় আর কে

পাকিস্তানী। পরে আমার আর-এক বন্ধুর কাছে ইংরেজ-চরিত্রের এই বিশেষত্বের কথা শুনেছিলাম। একজন সর্বদা চেষ্টা করে অন্য-জনের চেয়ে নিজের জ্ঞান বেশি দেখাতে। ভদ্রতাতেও তারা কেউ কারুর চেয়ে কম যেতে চায় না। তুমি যদি বলো, 'ইজন্ট ইট লাভলি?' তোমার সঙ্গী কিংবা সঙ্গিনী নিশ্চয়ই প্রত্যুত্তর দেবে, 'ও ইটস্ ওয়াণ্ডারফুল,—ডিভাইন।' যদি বলো, 'ইজন্ট ইট ব্যাড?' নিশ্চয়ই উত্তর শুনতে পাবে, 'ও ইটস্ বিস্টলি—হরিড।'

সকাল দশটাতে আমার বন্ধু হাজির হোলো। ততক্ষণে হোটেলে আমাদের কামরার সাংঘাতিক অবস্থা। আমার কন্যা বিছানাগুলো লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে। মাথার চুল এলোমেলো, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া। কিছুতেই তাকে কায়দায় না পেয়ে তার মা'র কাঁদো-কাঁদো অবস্থা।

'বাই জোভ! ঘরের এ কী অবস্থা?' বলে বন্ধু চেয়ারে বসলো।

তার প্রথম প্রশ্ন হোলো, 'টুপি এনেছো?'

'টুপি?' অপ্রস্তুত হয়ে ঢোক গিলে বললাম, 'না ভাই, টুপি তো আনিনি।'

'আনোনি?' অত্যন্ত হতাশ হয়ে সে যেন কথাটা বিশ্বাস করতে চাইলো না।

'নিতান্ত দরকার হলে না-হয় কিনে নেওয়া যাবে,' আমতা-আমতা করে আমি বললাম।

'না-না, কেনবার কথা বলছি না। টুপি আর আজকাল এখানে কেউ পরে না। আমি পঁয়তাল্লিশ টাকা দিয়ে টুপি কিনে এনে একেবারে বোকা বনে গিয়েছি। সবাই এখানে আসার আগে টুপি কিনে আনে।'

হাঁফ ছেড়ে আমি বললাম, 'তাহলে চা আনতে বলি?'

'তার আগে ঘরটাকে ভদ্রস্থ এবং তোমার কন্যাকে ভালো জামা-কাপড় পরিয়ে নিতে হবে। হোটেলের লোকেরা নইলে মনে করবে

কী? একেই ভারতীয়দের সম্বন্ধে এদের যা ধারণা—যেন জঙ্গল থেকে আসছে ভাবে।'

আমার কন্যা ততক্ষণে বিছানা ছেড়ে বন্ধুকে আক্রমণ করেছে। চক্ষের নিমেষে তার কোলে উঠে, নেকটাই টেনে, রুমাল বার করে, কলম নিয়ে কাড়াকাড়ি করে বন্ধুকে একেবারে বিপর্যস্ত ও বিপন্ন করে তুলেছে। কোনোরকমে তাকে আমরা বকে-ঝকে সেখান থেকে সরালাম। তার মা তার জামা-কাপড় বদলে দিতে লাগলো, আমি যতটা পারলাম বিছানাটা ভদ্রস্থ করলাম এবং আমার বন্ধু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নেকটাই ঠিক করতে লাগলো।

টেলিফোনে চায়ের কথা বলে দিলাম। সায়েব-বেয়ারা চা ও বিস্কুট দিয়ে গেলো। আমার বন্ধু তাকে বলে দিলো, লাঞ্চ আমরা বাইরে খাবো। বেয়ারা চলে যেতে বন্ধু আমার দিকে ফিরে বললো, 'বাইরে খেলেও খাবার চার্জ এরা ছাড়বে না। খবর না দিয়ে বাইরে খেয়ে এলে এরা আবার অসন্তুষ্ট হয়। আমাদের দেশের মতো তো নয়। খাবার নষ্ট করা এরা একেবারে পছন্দ করে না। কড়া র‍্যাশনিং এখানে।'

আমার স্ত্রী চা ঢাললেন। আমি সিগারেটের প্যাকেট বার করে বন্ধুকে দিলাম। একটা সিগারেট তুলে নিয়ে সে বললো, 'এখানে কেউ কাউকে সিগারেট অফার করে না, মনে রেখো। সিগারেটের যা দাম, আর পাওয়া যা কঠিন! দোকানের সঙ্গে চেনাশুনো না থাকলে কিংবা ভোরে উঠে সিগারেটের দোকানে হত্যে না-দিলে তুমি ভালো সিগারেট পাবেই না।'

'তাই নাকি?' বলে চায়ের পেয়ালায় আমি চুমুক দিলাম। অপরাধের মধ্যে চুমুক দেবার সময় একটু-আধটু শব্দ-টব্দ হচ্ছিলো।

বন্ধুবর হেসে প্রশ্ন করলো, 'এন্‌জয়িং ইয়োর টি?'

বললাম, 'বেশ লাগছে।'

'ইয়েস, ইউ সাউণ্ড সো।'—অর্থাৎ তোমার শব্দ থেকেই মালুম হচ্ছে, চা-টা বেশ ভালো জমেছে।

ব্যাপারটা হোলো, শব্দ করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেওয়া ইংলণ্ডের ভদ্রসমাজের রীতি-বিরুদ্ধ এবং এই প্রচলিত বিদ্রূপের কথা আমারও জানা ছিলো। আমার লজ্জিত হওয়াই উচিত ছিলো। কিন্তু লজ্জার বদলে একটু বিরক্ত হলাম এবং বললাম, 'জানো, বিলেত আসবার আগে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে অনেক গল্প হোলো। তোমার শরীর-স্বাস্থ্য কেমন আছে জানবার জন্য আমাকে বারবার বলে দিয়েছেন। তখন সকালবেলা। তিনি চা পান করছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, তিনি প্লেটে ঢেলে চা পান করছিলেন এবং একটু-আধটু শব্দ-টব্দ যে হচ্ছিলো না তা নয়।'

বন্ধু একটু লজ্জিতই হোলো। 'আরে, চটে গেলে কেন? ঠাট্টা বোঝো না?'

'খুব বুঝি। আমিও ঠাট্টা করছিলাম।'

পথে বেরিয়ে আমরা চারজন হাঁটতে লাগলাম। বন্ধু লণ্ডন শহর এবং শহরবাসী সম্বন্ধে অনেক খবর দিতে লাগলো। যথা,—'প্রথমেই তোমাদের আশ্চর্য লাগা উচিত এই দেখে যে, এতো যে মোটর আর বাস আর লরি চলেছে, কিন্তু কেউই হর্ণ বাজাচ্ছে না। আমি দু-বছর এখানে আছি—তার মধ্যে দু'বার মোটরের হর্ণ শুনেছি কি না সন্দেহ। —এই দেখো, খবরের কাগজের দিস্তে রাস্তার পাশে সাজানো রয়েছে। কিন্তু লোক কেউ নেই।—কী করে কিনবে? এই দেখ কৌটো— এখানে দু-পেনি ফেলে দাও, একটা কাগজ তুলে নাও। ব্যাস। তুমি পেনি দিলে কি না দেখবার কেউ নেই, দাম না দিয়েও অনায়াসে তুমি কাগজ নিয়ে যেতে পারো। কেউ কিছু বলবে না। অথচ পেনি না রেখে কাগজ কেউ নেয় না। কাগজ চুরি যায় না। আমাদের দেশে এ-ব্যবস্থা কল্পনা করতে পারো?—এই দেখো বাড়ির দরজায় দুধের বোতল রয়েছে। বাড়ির লোকেরা খালি দুধের বোতল রাত্রেই

দরজার বাইরে রেখে দেয়, পরের দিন তারা ঘুম থেকে ওঠার আগেই দুধওলা খালি বোতল নিয়ে ভরা বোতল রেখে যায়। এখানে দুধের ভারি অভাব, অথচ কেউ কারুর দুধের বোতল চুরি করে না।—কল্পনা করতে পারো?'

বললাম, 'আমাদের দেশে এভাবে কাগজ বিক্রির ব্যবস্থা নেই, দুধ বিলির ব্যবস্থা নেই সত্যি। থাকলে কী হোতো কী করে বলবে? হয়তো কিছুই চুরি যেত না, হয়তো কিছু চুরি যেতো। চুরি যেতো না—এই কথা কল্পনা করাই আমার পক্ষে সহজ। যারা নিজেদের দেশে সামান্য দুধ কিংবা পেনি চুরি করে না তারাই আমাদের দেশে দেড়শো বছর ধরে কী করে পুকুর-চুরি করে এলো—এই কথাটাই কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কঠিন হচ্ছে।'

ইতিমধ্যে আমার কন্যা আবার স্বরূপ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। দিব্বি এতোক্ষণ হাঁটছিলো, অকস্মাৎ ফুটপাথের উপর উবু হয়ে বসে ঘোষণা করলো, তার পা অত্যন্ত ব্যথা করছে—আর হাঁটা সম্ভব নয়। তার মা বিরক্ত হয়ে ধমক দিতে উদ্যত হলে বন্ধু হাঁ-হাঁ করে উঠলো, 'আহা বকবেন না, বকবেন না। বকলে ছেলেরা আরো বিগড়ে যায়। এরা কেউ ছেলেমেয়েদের বকে না, মারা তো দূরের কথা।'

'খুব ভালো কথা, ভাই। তুমিই এর শিক্ষার ভার গ্রহণ করো,' এই বলে কন্যাকে তার কোলে তুলে দিলাম। বন্ধুবর বহু কষ্টে মুখ হাসি-হাসি করে তাকে কোলে নিয়ে হাঁটতে লাগলো। আরো খানিক হাঁটবার পর সে বললো, 'এইবার বাঁয়ে। এই দেখো 'ল্যাঙ্কাস্টার গেট' টিউব স্টেশন। এখান থেকে আমরা টিউবে যাবো।'

লণ্ডনের মধ্যে বাস্তবিক অবাক হলাম মাটির তলার ট্রেনের এই কাণ্ডকারখানা দেখে। লণ্ডনের মাটির তলায় এ-মাথা ও-মাথা পর্যন্ত চলে গেছে এই টিউবের সুড়ঙ্গ পথ। মাটির উপর স্টেশন, মাটির নিচে ট্রেন। প্রত্যেক স্টেশনে এই রেলপথের বড়-বড় মানচিত্র। এই মানচিত্র দেখে তুমি ঠিক করে নাও, কোথাও যাবে। অমুক জায়গায়

যেতে হলে অমুক-অমুক জায়গায় ট্রেন বদল করতে হবে। লণ্ডনে কারুর ঠিকানা জানতে হলে প্রথমেই প্রশ্ন করবে কোন টিউব স্টেশনের কাছে সে থাকে। লণ্ডনে পথ হারালে খোঁজ করে যে-কোনো কাছাকাছি টিউব-স্টেশনে যাও। সেখানে তো মানচিত্র টাঙানোই আছে। টিউবে চড়ে অনায়াসে নিজের হোটেলে পৌঁছে যাবে। তাই লণ্ডনের মত বিরাট আর জটিল শহরে নিতান্ত হাঁদা না হলে পথ হারাতে পারে না। লণ্ডনে বাস আছে ট্যাক্সি আছে, ট্রামও আছে কোথাও-কোথাও। কিন্তু টিউবের কাছে কেউ লাগে না। রাতদিন কেউ ট্যাক্সি নিয়ে ঘুরতে পারে না। বাসে যেখানে ঘণ্টাখানেক লাগে, টিউবে কুড়ি মিনিট। আর ট্রাম তো সর্বত্র নেই। তাই কোথাও যাওয়া মানেই টিউবে যাওয়া। কোনো কারণে টিউব যদি না চলে, সমস্ত লণ্ডন থেমে থাকে—লণ্ডনবাসীরা চোখে অন্ধকার দেখে।

টিকিট কিনে আমরা লিফটে করে পাতালে নামতে লাগলাম। দিনের আলো নিভে গেলো। বিজলি বাতির রাজত্ব। এক জায়গায় লিফট থামলো। তারপর নানা সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা টিউব ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে পৌঁছলাম। টিউবের জন্য বড়-একটা অপেক্ষা করতে হয় না। মিনিট কতক ছাড়া-ছাড়া বিকট শব্দ করে হুড়মুড় করে ট্রেন এসে যায়। দুটো লাইনের মাঝখানে ইস্পাতের অনেকটা লাইন। মাঝের লাইনে বিদ্যুৎ রয়েছে। সেই বিদ্যুতে ট্রেন চলে। বিদ্যুতে চলে বলেই বিদ্যুৎগতিতে ছুটতে পারে এই ট্রেন। থামতে যেমন এর সময় লাগে না, ছুটতেও তেমন সময় নেয় না। মাটির তলায় শান-বাঁধানো সুড়ঙ্গপথে ছোটে বলে শব্দটা শতগুণ বেড়ে যায়। ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছো, কোথাও শব্দ নেই। তারপর সামান্য গুরগুর ধ্বনি। দেখতে-দেখতে সেই সামান্য গুরগুর শব্দ সহস্রগুণ বেড়ে উঠলো। চারিদিক এখনি বুঝি ভেঙে চুরমার খানখান হয়ে যাবে! ঐ তো ট্রেন দেখা যাচ্ছে! এতো জোরে

আসছে, প্ল্যাটফর্মে থামবে কী করে? এই বুঝি গতি কমলো। হ্যাঁ, কমেছে তো! কিন্তু প্ল্যাটফর্মের মধ্যে নিজেকে রুখতে পারবে তো? আরে তাই তো। হ্যাঁ, থেমে গেলো। বিদ্যুতেই ট্রেনের দরজা খোলে। থামতেই দরজাগুলো খুলে গেলো। বহু লোক নামলো। বহু লোক উঠলো। বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না; চটপট উঠে নাও। আবার আপনা থেকেই দরজাগুলো এঁটে গেলো। উঠেছো তো? এইবার চলতে শুরু করেছে। চমৎকার বসবার জায়গা। যদি জায়গা পাও তো বসে পড়ো। নইলে দাঁড়িয়েই থাকো। বেশিক্ষণের মামলা নয় তো। বড়-জোর দশ-পনেরো কি কুড়ি মিনিট। ট্রেন চললে আর ঐ-রকম ভয়ঙ্কর শব্দ পাওয়া যায় না।—এ বেশ মজার ট্রেন। ফার্স্ট সেকেণ্ড কি থার্ড ক্লাস বলে কোনো বিভাগ নেই। বিভাগ আছে শুধু যারা ধূমপান করে আর করে না, তাদের জন্য আলাদা-আলাদা কামরার। ইঞ্জিন নেই। লেডিজ সিটের বালাই নেই। একবার বসতে পেলে আর কেউ তোমায় ওঠাতে পারবে না। কোনো মহিলা দেখে যদি তুমি ভদ্রতা করে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াও, তাহলে নিজেই বোকা বনে যাবে। ভদ্রমহিলা তোমাকে শুধু ধন্যবাদই জানাবেন, তোমার জায়গায় বসবেন না। কোনো বৃদ্ধকে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে জায়গা ছাড়বার জন্য হাঁকাহাঁকি করতে হয় না। মহিলারাই নিজে থেকে জায়গা ছেড়ে বসবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

বসবার জায়গার অভাব হোলো না। আমরা সবাই বসতে পেলাম। প্রত্যেক কামরাতেই সেই লাইনের মানচিত্র আঁটা রয়েছে। কোথায় চলেছো, কোন ইস্টিশানের পর কোন ইস্টিশান আসছে, বোঝবার এতোটুকু অসুবিধে নেই। আমরা চলেছি 'সেন্ট্রাল লাইনে।' এইরকম আরো নানা লাইন আছে—যেমন ধরো, 'পিকাড্যালি লাইন,' 'বেকারলু লাইন' ইত্যাদি। যদি তুমি এখান থেকে 'বেকারলু লাইনে'র কোনো ইস্টিশানে যেতে চাও, তাহলে মানচিত্র

দেখে ঠিক করে নাও কোন জংসন ইস্টিশানে ট্রেন বদল করতে হবে।

এইসব আমি শিখছিলাম। বন্ধুকে প্রশ্ন করলাম, 'ইণ্ডিয়া হাউসে যেতে হলে আমাদের তো হলবোর্নে (Holborn) নামতে হবে।'

সে উত্তর দিলো, 'হলবোর্ন নয়, উচ্চারণ হবে হোবোর্ন। প্রথম-প্রথম সবাই ভুল করে।'

আমার কন্যা এতোক্ষণ হকচকিয়ে ছিলো। ক্রমশ সে ধাতস্থ হচ্ছিলো। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'কী মজা—আমরা হবোনে যাচ্ছি! —কী রকম বোন, বাবা? ভাই বোন? না বন-জঙ্গল? সেখানে ভালুক আছে? আমাকে একটা ভালুক দিয়ো না বাবা!'

বন্ধুর দিকে চেয়ে বললাম, 'ভাগ্যিস টিউবে এতো আওয়াজ হয়! নইলে এই জংলি মেয়েটার চেঁচামেচিতে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারতাম না!'

বন্ধু বললো, 'এদেশের ছেলেরা বাস্তবিক ওয়েল-ট্রেইণ্ড হয়। কী করে হয় জানি না। তুমি কোনো আর্ট গ্যালারিতে গেলে দেখবে, বাপ-মায়ের সঙ্গে কতো বাচ্চারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কিন্তু টুঁ শব্দটি করছে না।'

মিনিট-কয়েক পরে আমরা হোবোর্নে নামলাম। পাতাল থেকে উপরে ওঠার জন্য এখানে লিফটের বদলে রয়েছে 'এসকেলেটর'। এসকেলেটর হচ্ছে চলন্ত সিঁড়ি। একদিকের সিঁড়ি ক্রমাগত উঠছে, আর একদিকের ক্রমাগত নামছে। যদি উপরে উঠতে চাও, কিংবা নিচে নামতে চাও, তাহলে সেই চলন্ত সিঁড়ির একটি ধাপে গিয়ে দাঁড়াও। আপনা থেকেই উপরে উঠবে, কিংবা নিচে নামবে। সিঁড়ির ডানদিকের রেলিং ধরে ধাপে-ধাপে অনেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যাদের তাড়া, বাঁদিকের ফাঁকা জায়গা দিয়ে চলন্ত সিঁড়িকেও টেক্কা মেরে দৌড়ে নামছে বা উঠছে।

উপরে এসে দেখি, রোদ্দুর মিলিয়ে গেছে। মেঘে ঢাকা সমস্ত আকাশ, ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। পথে বর্ষাতির ভিড়। ছাতা

খুব কম লোকে ব্যবহার করে। এই মেঘে-ঢাকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি-পড়া মিয়োনো চেহারাই হচ্ছে লণ্ডনের আসল রূপ। চকিতে যখন রোদ্দুর এসে পড়ে, নীল আকাশ যখন হেসে ওঠে, তখন চারিদিকে যেন উৎসব পড়ে যায়। মেঘলা আকাশ আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি এদের নিত্য সঙ্গী। তাই বাদলাকে এরা গ্রাহ্যই করে না। পেরাম্বুলেটরে নেহাৎ শিশুকেও রেনকোটে মুড়ে এরা খোলা বাতাসে নিয়ে বেড়ায়, বুড়িরা বাজার করবার থলি নিয়ে হাঁটে, ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে-কলেজে যায়। নেহাৎ ঝমঝমে বৃষ্টি আর দুরন্ত ঝড় না হলে কেউ বাড়িতে আটকা থাকে না। আমাদের দেশের মতো হঠাৎ আকাশ-অন্ধকার-করে-আসা নিকষ কালো মেঘ আর ঝমঝমে বৃষ্টি বছরে এখানে ক'দিনই বা হয়! আমাদের দেশের বর্ষার একটা জমকালো রূপ আছে, এখানকার বর্ষা নিতান্তই ম্যাড়মেড়ে, মনমরা।

প্রথমে ঠিক ছিলো ইণ্ডিয়া হাউসে গিয়ে আমরা লাঞ্চ খাবো। লণ্ডনের মধ্যে সবচেয়ে সস্তার লাঞ্চ ইণ্ডিয়া হাউসে। কিন্তু ক্ষিদে পেয়েছে বলে কন্যা বায়না ধরায় এবং তখনো ইণ্ডিয়া হাউসে লাঞ্চের কিছু দেরি থাকায় বন্ধু বললো, কোনো রেস্তোরাঁয় ঢুকে বাচ্চাকে কিছু খাইয়ে নিতে। তাই ঠিক হোলো।

আবার মাটির নিচে নামলাম এবং টিউব ধরে নটিংহিল গেট-এ উঠলাম। এ অনেকটা ডুব-সাঁতার কেটে লণ্ডনে ঘোরার মতো। এক জায়গায় ডুব গালো আর এক জায়গায় হুস করে ভেসে ওঠো। লণ্ডন শহর এমনিতেই প্রকাণ্ড, এতো প্রকাণ্ড যে কল্পনা করা কঠিন। কলকাতার মতো অনেকগুলো শহর জোড়া দিলে তবে লণ্ডনের সমান হবে। প্রায় আটশো বিভিন্ন বাস-রুট আছে লণ্ডনে। তাই এমনিতেই এই শহরের পথ-ঘাটের সঙ্গে ভালো করে পরিচিত হতে হলে অনেক সময় ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। তার উপর এই টিউবের ব্যবস্থা থাকায় শহরটার সঙ্গে ভালো করে পরিচিত হবার সুযোগই হয় না। খোদ লণ্ডনবাসীদের অধিকাংশই ভালো করে লণ্ডনকে চেনে না।

যে যে-পাড়ায় থাকে, সেই পাড়ার আশেপাশের রাস্তাঘাট কিছু-কিছু তার জানা হয়ে যায়—তার বেশি নয়।

নটিংহিল গেটে নেমে বর্ষাতি চড়িয়ে খানিক হাঁটার পর বন্ধু বললো, 'এই যে ডানদিকে।' ডানদিকে সিঁড়ি নিচে যাবার। সেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আমরা রেস্তরাঁয় পৌঁছলাম। এখানে অনেক বাড়িরই নিচের তলা ফুটপাথ আর রাস্তা থেকে নিচে। এই নিচের তলাকে বলে বেসমেণ্ট।

দু'তিনটে ঘর পেরিয়ে যে-ঘরে আমরা বসবার জায়গা পেলাম, দেখি, আরো অনেক বাপ-মা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে সেই ঘরে খাওয়াতে বসেছে।

বন্ধু আমার কন্যাকে প্রশ্ন করলো, 'কী খাবে বলো তো, রুনুবাবু?'

গলায় ন্যাপকিন এঁটে পা দোলাতে-দোলাতে অম্লানকণ্ঠে রুনুবাবু বললেন, 'শুক্তো দিয়ে ভাত খাবো। পোরের ভাজা খাবো। দই-মাছ খাবো। বাটি-চচ্চড়ি খাবো। পোস্তর বড়া খাবো।—আর কিচ্ছু খাবো না।'

বন্ধুর চোখদুটো চকচক করে উঠলো। বোধহয় এই প্রথম দেশের জন্য তার মন-কেমন করে উঠলো। বছর দুই এখানে থেকে ক্রমাগত আলুসেদ্ধ আর মশলাবিহীন খাবার খেয়ে তার অরুচি ধরে গেছে। ইংরেজরা ভালো মোটর-গাড়ি বানাতে পারে, ভালো জামা-কাপড় তৈরি করতে জানে, বন্দুক-কামান-উড়োজাহাজ-জাহাজ-যন্ত্রপাতি তৈরিতেও তারা পিছিয়ে নেই, হয়তো শীঘ্রই এ্যাটম-বোমাও বানিয়ে ফেলবে। কিন্তু হায়, শুক্তো তৈরির ফরমুলা কখনো আয়ত্ত করতে পারবে না—বাটি-চচ্চড়ি, পোরের ভাজা, পোস্তর বড়া, নিম-বেগুনের রহস্য ভেদ করা তো দূরের কথা!

ধরা-ধরা কণ্ঠে বন্ধু বললো, 'রুনুবাবু, ও-সব তো এদেশে পাওয়া যায় না! আর কী খাবে বলো।'

'ও-সব পাওয়া যায় না? কী রকম ছাই দেশ এটা?' বেশি উঁচু গলাতেই কন্যা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো।

আমরা, তার বাবা-মা, লজ্জিত হয়ে হাঁ-হাঁ করে উঠলাম। 'ছি-ছি, তোমাকে বারবার বলেছি না বুড্‌ঢা, ফিসফিস করে কথা বলতে। ঐ দেখো, আরো কত তোমার মতো বাচ্চারা খাচ্ছে—কেউ কি হৈচৈ করছে?'

অন্যান্য টেবিলের সুবোধ শান্ত বাচ্চারা গাল ফুলিয়ে খাবার চিবুতে-চিবুতে সকৌতুকে আমাদের টেবিলে, বিশেষ করে রুনুর দিকে চেয়ে দেখছিলো। আমাদের ভাষা বুঝতে না পারলেও টেবিলে কিছু যে একটা গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে, তারা বেশ তা উপলব্ধি করছিলো বলেই মনে হোলো।

বন্ধু আবার প্রশ্ন করলো, 'কই বললে না তো আর কী খাবে?'

'তাহলে পোলাও খাবো, চিংড়ি-মাছের মালাই-কারি খাবো, মুগের ডাল দিয়ে মুড়িঘণ্ট খাবো, তোপসে মাছ ভাজা খাবো—'

'সুপ আগে খাও—তারপর মাছ-ভাজা খাওয়াবো,' কোনো রকমে আমতা-আমতা করে বন্ধু বললো। তাকে দেখে মনে হোলো এতো কষ্ট সে জীবনে পায়নি।

সুপ একচামচ মুখে দিয়েই থু-থু করে রুনুবাবু ফেলে দিলো। আমরা তো প্রমাদ গণলাম। একে নিয়ে লণ্ডনে থাকবো কী করে? বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আরো কয়েক চামচ সুপ তার মুখে দেওয়া গেলো। আমার কন্যা তখন মরিয়া হয়ে গেছে। টেবিলের উপর সজোরে হাত ঠুকে সে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠলো, 'ছাই দেশ, ছাই দেশ, বিচ্ছিরি—।' তার হাত লেগে সুপের প্লেট উল্টে গেলো, অন্যান্য টেবিল থেকে বহু জোড়া কৌতূহলী চোখ আমাদের উপর নিবদ্ধ হোলো। আমরা মনে-মনে তখন প্রার্থনা করছি: মা ধরণী, দ্বিধা হও—

এমন সময় সেই আশ্চর্য কাণ্ড ঘটলো। পাশের টেবিলের বাচ্চা

...কের নিমেষে তার স্যুপের প্লেট উল্টে ফেলে টেবিলে ঘুসি মেরে তাল দিতে-দিতে গেয়ে উঠলো, 'চাই ডেশ, চাই ডেশ—' তাই দেখাদেখি অন্যান্য টেবিলের বাচ্চারাও, এতোক্ষণ যারা নিতান্ত শান্তশিষ্ট সুবোধ ... বসে ছিলো, তারাও কোরাস ধরলো : 'চাই ডেশ, চাই ডেশ—'

...ৎ—ছাই দেশ, ছাই দেশ!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেলো। আমাদের কামরায় তখন বাচ্চাদের বিপুল উল্লাস এবং হর্ষধ্বনি। ওয়েটার আমার পাশে দাঁড়িয়ে হেসে বললো, 'ডোণ্ট ওয়ারি, চিলড্রেন উইল বি চিলড্রেন—আর কী দেবো?'

বললাম, 'মাছ-ভাজা থাকে তো আনো।'

বন্ধু বললো, 'হ্যাঁ, ফ্রায়েড ফিস।'

এতোগুলি বাচ্চার হল্লা দেখে আমার কন্যার মনমেজাজ ততক্ষণে অতিমাত্রায় ভালো হয়ে গেছে।

উৎফুল্ল হয়ে সে বলে উঠলো, 'কী মজা! আমার জন্য মাছ-ভাজা আসছে! কী মজা—'
